স্মাথ্য

শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

পাথেয়

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

একাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত
'দিব্য দর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত
শ্রীশ্রীবাবার লিখিত প্রবন্ধ সঙ্কলন

দেবসঙ্ঘ
পোঃ দেবসঙ্ঘ
দেওঘর (এস. পি.) বিহার

প্রকাশক :

শ্রীমতী সুষমা বিদ্

দেবসঙ্ঘ

পোঃ—দেবসঙ্ঘ, দেওঘর (এস. পি.) বিহার।

প্রথম প্রকাশকাল—শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা—১৩৮০,
৩১শে মার্চ্চ—১৯৭৪

মূল্য : পাঁচ টাকা ;
বাঁধান—ছয় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :

দেবসঙ্ঘ

পোঃ দেবসঙ্ঘ, দেওঘর (এস. পি.) বিহার।

দেবসঙ্ঘ

পোঃ—বড়বহেরা,

ভায়া :— নবগ্রাম, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ

মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মুদ্রক :

দিব্যদর্শন প্রেস

পোঃ—দেবসঙ্ঘ, দেওঘর (এস. পি.) বিহার।

॥ ভূমিকা ॥

মানুষের অন্তরে রয়েছে এক অতৃপ্ত ক্ষুধা। ধনে নয়, জনে নয়, পুত্র কলত্রে নয়, বিপুল বৈভব বা জাগতিক কোন কিছুতেই সে ক্ষুধাকে মিটাতে পারে না। মানুষের চির বৈরাগী মন সকল পাওয়ার মাঝে বার বার কেঁদে উঠে কি যেন তার পাওয়া হয়নি।

এই পরম পাওয়া কি; কি পেলে সকল চাওয়ার সকল পাওয়ার পরিশেষ হবে এ প্রশ্ন যাদের মনে স্থান পেয়েছে; এ প্রশ্ন নিরসনের জন্য যাদের অন্তর কেঁদে উঠেছে তারাই আত্মজ্ঞান লাভের, জীবনের পরিপূর্ণতার মুক্তি মন্দিরে পৌছাবার অভিসারী। তাদের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়—

"আমার যতই দু'হাত ভরে ওঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

জীবনের দীপশিখা তাদেরই জ্বলে উঠে।

জীবনের দীপশিখা ক্ষণে ক্ষণে প্রখর আলো বিকরিত করে জ্বলে, ক্ষণে ক্ষণে স্তিমিত হয়ে আসে, ক্ষণে বুঝি বা নিবে যায়। তাই বেদনার সুরে বেজে উঠে—

"যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।"

জীবন দীপশিখাকে অম্লান জ্বালিয়ে রেখে পথ চলতে হলে

প্রয়োজন—পাথেয়। দিব্য জীবন পথে চলতে যা সহায়তা করে তাই পাথেয়। পাথেয় যার নেই, পাথেয় যার ফুরিয়ে গেছে পথের মাঝখানে পথ চলা তার আর হয় না। জীবনের পরিপূর্ণতার মুক্তিমন্দিরে পৌঁছান তার পক্ষে সুদূর পরাহত। পাথেয় হতেই আসে আত্মকৃপা, শাস্ত্রকৃপা ও গুরুকৃপা।

দেবসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ বিরচিত সঙ্ঘ পত্রিকা দিব্যদর্শনে প্রকাশিত প্রথম দশ বর্ষের প্রবন্ধগুলো ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে পাথেয় নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীশ্রীবাবার সেই প্রবন্ধগুলো আত্মজিজ্ঞাসু, ধর্ম্মপরায়ণ অগণিত মানুষের মনে প্রেরণা জাগিয়েছে, সুপ্ত জীবন বীণায় তান তুলেছে, অন্ধকারে আলোর ঝর্ণা ধারা বয়ে এনেছে।

বর্ত্তমানে দিব্যদর্শনে প্রকাশিত একাদশ বর্ষ হতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রবন্ধগুলো পাথেয় (দ্বিতীয় খণ্ড) নামে প্রকাশিত হলো। পরবর্ত্তী বর্ষের প্রবন্ধগুলো আশ্রম হতে বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

পাথেয় দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ত্তমান সংস্কারটি আমি আমার স্বামী "৺নগেন্দ্র ভূষণ বিদ্ স্মৃতি" রূপে শ্রীগুরুর চরণে প্রণতি জানিয়ে আমার স্বর্গীয় স্বামীর কল্যাণার্থে আত্ম ও ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম।

নিবেদক—

দেবসঙ্ঘ, দেওঘর সুষমা বিদ্

॥ সূচীপত্র ॥



শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ

জীবনের ছন্দে ছন্দে মাকে দেখ

ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বরুণের পুত্র ভৃগু তাঁহার পিতার নিকট আত্মজ্ঞান লাভের উপদেশ চাহিলেন। ঋষি বরুণ পুত্রকে বলিলেন—যাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি হয়, যাহার দ্বারা বর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হয় এবং যাহাতে পুনরায় বিলীন হইয়া যায় তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। "তং হোবাচ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি। যং প্রযন্ত্য-ভিসংবিশন্তি। তদ্ ব্রহ্মেতি।" আরও বলিলেন—অন্ন (অন্নময় কোষ, শরীর) প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাগেন্দ্রিয় ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার স্বরূপ। ভৃগু তপস্যায় মগ্ন হইলেন। তিনি তপস্যা করিতে যাইয়া প্রথম অনুভব করিলেন—অন্নই ব্রহ্ম। কারণ অন্ন গ্রহণ না করিলে এই শরীর ক্ষীণ হইয়া যায়, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। তাই অন্নই প্রাণ, অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন গ্রহণ করিয়াই বিশ্বের সমস্ত প্রাণী বাঁচিয়া রহিয়াছে। কেহ ভাত কেহ রুটী কেহ শাকসব্জী গ্রহণ করিতেছে। ইতর জন্তুগণও তাহাদের খাদ্য ঘাস প্রভৃতি তাহাদের আহার্য্য অন্নরূপেই গ্রহণ করিতেছে। এক কথায় যাহা খাদ্যবস্তু তাহাই অন্ন, তাহাই প্রাণীর প্রাণ। চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন। তিনি অন্নকেই ব্রহ্ম জানিয়া তাঁহার উপাসনায় নিমগ্ন হইলেন। কিভাবে দেশে বহু অন্ন হইবে, কি ভাবে দেশের লোক বহু অন্ন পাইবে তাহা

নিয়া গবেষণা (ধ্যান) করিতে লাগিলেন। শুধু গবেষণাই নহে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া বাস্তব ক্ষেত্রেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। কোন মানুষেরই অন্নকষ্ট রহিল না। সকল মানুষই সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে লাগিল। তপস্বী ভৃগু লক্ষ্য করিলেন—অন্নের অভাব দূর হইলেই মানুষ চরম ও পরম সুখের অধিকারী হয় না। মানুষের মধ্যে রহিয়াছে আরও কত দ্বন্দ্ব। বহু অন্নের অধিপতি হইয়াও মানুষ জরা, মৃত্যু, ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে না। বহু অন্নের অধিপতি হইয়াও হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। বহু অন্নের অধিপতি হইয়াও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। আশার নিবৃত্তিও হইতেছে না।

তপস্বী ভৃগু পিতা বরুণের নিকট পুনরায় যাইয়া বলিলেন—আমি ভাবিয়াছিলাম অন্নই ব্রহ্ম। বহু অন্নের অধিপতি হইলে, দেশের অন্নাভাব দূর হইলে মানুষ পরম ও চরম শান্তি লাভ করিবে, আমিও চরম শান্তি লাভ করিব। কিন্তু তাহা হইল কৈ? আমি ব্যর্থ হইয়াছি। আমাকে আপনি পুনরায় উপদেশ প্রদান করুন। পিতা বরুণ পুত্রকে পুনরায় তপস্যা করিতে বলিলেন।

ভৃগু তপস্যা করিয়া জানিলেন—প্রাণই ব্রহ্ম। জীবের জীবদেহে প্রাণ আছে বলিয়াই জীব চলিতে পারে, বলিতে পারে, কর্ম্ম করিতে পারে, অন্ন উপার্জ্জন করিতে পারে। এই প্রাণ জীবদেহে না থাকিলে কে অন্ন গ্রহণ করিত? প্রাণের জন্যই অন্নের প্রয়োজন। প্রাণীর প্রাণ না থাকিলে অন্নাদির কোন প্রয়োজনই থাকিত না। মৃত্যুর পর প্রাণ যখন জীবের

দেহ হইতে বাহির হইয়া যায় তখন সে আর অন্ন গ্রহণ করে না। অতএব অন্ন অপেক্ষা প্রাণই শ্রেষ্ঠ। ভৃগু প্রাণের তপস্যা করিতে লাগিলেন। বিশ্বময় এক প্রাণ সত্তাকে দেখিতে লাগিলেন। যেই প্রাণ মানুষের দেহে সেই প্রাণই ইতর জন্তুদের মধ্যে, সেই প্রাণই বিশ্ব চরাচরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই প্রাণই জীবের জীবন, এই প্রাণই জীবের সর্ব্বস্ব। "প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।"

ভৃগু এবারও ব্যর্থ হইলেন। তাঁহার মনস্কাম সিদ্ধ হইল না। তিনি পুনরায় তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞ গুরু বরুণের নিকট গেলেন। পিতা হাসিয়া বলিলেন—বৎস! তপস্যা কর। তপস্যা দ্বারাই সব জানিতে পারিবে।

ভৃগু পুনরায় তপস্যায় ব্রতী হইয়া অনুভব করিলেন—মনই ব্রহ্ম। মন চঞ্চল হইলে প্রাণ চঞ্চল হয়। মন শান্ত হইলে প্রাণ শান্ত হয়, মন সুচিন্তা করিলে প্রাণ নির্ম্মল হয়, মন কুচিন্তা করিলে প্রাণ কলুষিত হয়। এই মনই ব্রহ্ম। মনই উত্তম তত্ত্ব। তিনি গভীর ভাবে মনের উপাসনায় নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু বহু তপস্যা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—মন তাহার নিজের শক্তিতেই মননশীল হয় না। মনের অবস্থিতি ও গতি সকলই নির্ভর করিতেছে মনের তলদেশে যে রহিয়াছে নির্ম্মল দর্পণবৎ বিজ্ঞান বা বুদ্ধি তাহাতে। মন এই বুদ্ধির সত্তায়ই সত্তাবান। বুদ্ধি মনকে আশ্রয় না দিলে তাহার অবস্থিতি সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়বর্গ মনের সাহায্যে যাহা দেখে, যাহা শুনে তাহা বুদ্ধির নিকট মন উপস্থিত না করিলে মন কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে না। মন শুধু বার্ত্তা বাহকের ন্যায় বুদ্ধির সমীপে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ যাহা পায় তাহা

নিবেদন করে। বুদ্ধি বস্তুর গুণ, দোষ প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া দেয়। বুদ্ধি সারথি। মন লাগাম। ইন্দ্রিয় সকল ঘোড়া। বিষয় হইল ঘোড়াদের বিচরণভূমি। এইরূপে ভৃগু স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ভৌতিক জগৎ হইতে চিত্তের জগতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। এইবার চিত্ত হইতে দহরে প্রবেশ করিলেন। তপস্যায় কি গভীর নিষ্ঠা এই ঋষি-পুত্র ভৃগুর তাহা ভাবিতে গেলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মন্ত্র নাও, মালা নাও, তিলক কাট, লাল কাপড় পর, বনে গমন কর প্রভৃতি কোন উপদেশই পিতা বরুণ পুত্রকে দিলেন না। শুধু বলিলেন—তপস্যা কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিব—শক্তি সঞ্চার করিব। ধীরে ধীরে তোমার জীবনের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত হইবে। তখন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সান্নিধ্যে বসিয়া শিষ্যগণ তপস্যা করিতেন। অলক্ষ্যে গুরুর শক্তি শিষ্যকে উদ্বোধিত করিত। বহু শিষ্য করিবার প্রথাও তখন ছিল না। বৈদিক যুগের ঋষি-দের বহু শিষ্য ছিল না। দ্বাপরের শেষে পৌরাণিক যুগে দুর্ব্বাসাদি ঋষির বহু শিষ্য ছিল ইহা দেখা যায়। কিন্তু সেই শিষ্যদের মধ্যে কেহ ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন ইহা উল্লেখ নাই। তাহারা ভোজনপ্রিয় ও কলহপ্রিয়ই বেশী ছিলেন। যাহা হোক্ ভৃগু পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় তপস্যায় মগ্ন হইলেন। এইবার তিনি জানিলেন—ধীর-বুদ্ধিকে। এই বুদ্ধিই আত্মজ্ঞান লাভের শেষ দ্বার। ভৃগু অন্নময় প্রাণময়, মনোময় কোষ অতিক্রম করিয়া এইবার বিজ্ঞানময় কোষের বিরাট্ কক্ষে উপ-নীত হইলেন। বুদ্ধির যে অংশে বিষয় ও জগৎ অর্থাৎ মন, প্রাণ ও অন্ন সেই অংশ মলিন ও বিক্ষেপ পূর্ণ হইলেও, রজো ও তমোগুণ মিশ্রিত হইলেও বুদ্ধির অন্য অংশে

রহিয়াছে শুদ্ধ ও সত্ত্বগুণ। তপস্যার দ্বারা রজো ও তমোগুণ অভিভূত হইলে সত্ত্বগুণ সমন্বিত বুদ্ধির উদয় হয়। ভৃগু তপস্যার দ্বারা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হইলেন। তিনি অনুভব করি-লেন—এই সারথি দুই দিকেই রথ চালনা করিতে জানেন। যাহারা বাহির বিশ্বে নাম ও রূপের জগতে বিচরণ করিতে চাহে তিনি তাহাদিগের রথ ঐ দিকেই পরিচালনা করেন। আর যাহারা আসিয়া কাতরভাবে বুদ্ধির নিকট প্রার্থনা করে —আমাদিগকে উজ্জ্বল ধী দান্ কর, আমাদিগকে নির্ম্মল ও শুদ্ধ কর, আমরা সেই কল্যাণতম রূপকে দেখিব। বুদ্ধি তাহা-দিগকে বহন করিয়া নিয়া যায় প্রজ্ঞার ভূমিতে, আনন্দময় ক্ষেত্রে। আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দই প্রজ্ঞা। এই আনন্দ স্বরূপকে জানিলে—'ন বিভেতি কুতশ্চন'। আর কোন কিছু হইতেই ভয় থাকে না।

আজ তোমরা সমবেত হইয়াছ সেই আনন্দস্বরূপকে জানি-বার জন্যই। অনুসন্ধিৎসু হও, জিজ্ঞাসু হও, তপস্যাপরায়ণ হও। আনন্দ হইতে জাত হইয়া কিরূপে অন্নময় কোষে আসিয়া আবদ্ধ হইয়াছ সেই তত্ত্বটি জান। শুধু 'অন্ন' 'অন্ন' করিয়া আলেয়ার পেছনে পেছনে ছুটিও না, একটু স্থির হও, একটু শান্ত হও, নিজেকে নিজে বিশ্লেষণ কর। আহারে সংযত হও, বিহারে সংযত হও, কদর্য রুচি সকল ত্যাগ কর। সাংসারিক কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে একবার মন, প্রাণ, বিজ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করিয়া অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা কর। প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত অন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা কর। পুনঃ পুনঃ বিফলতাই একদিন সফলতাকে নিয়া আসিবে। শুধু বাহিরে ঘুরিয়া শান্তি পাইবে না। 'ন কর্ম্মণা, ন প্রজয়া, ন ধনেন।'

বহু কর্ম্মের দ্বারা নহে, বহু পুত্র পৌত্রের দ্বারা নহে, বহু ধনের দ্বারা নহে। একমাত্র তপস্যার দ্বারাই—তপস্বী ভৃগুর ন্যায় তপস্যা দ্বারাই শনৈঃ শনৈঃ সেই সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত আনন্দ ধামে যাইয়া পৌছিতে পারিবে।

সংসারের প্রয়োজনে সাংসারিক কাজ সবই করিবে। দেশের কল্যাণে দেশের কাজও করিবে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে দেশকে রক্ষা করিবে। সমাজের কল্যাণার্থে সমাজকে আদর্শ-পথে পরিচালিত করিবে, কিন্তু মনে রাখিও ইহার মূলে যে শাশ্বত সত্তা রহিয়াছে তাহার সন্ধান যতদিন না পাইতেছ ততদিন কুলালচক্রবৎ এই সংসারচক্রে ঘুরিতে হইবে। সকল কর্ম্মই করিবে, কিন্তু অন্তরের নিভৃত নিকেতনে যে শক্তিময় বিরাজিত রহিয়াছেন ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া বিদ্যুৎ ও অধিক ফসল উৎপাদনের প্রচেষ্টা কর, ইস্পাতের কারখানায় কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিশেষ যন্ত্র নির্ম্মাণ কর। দেশের কল্যাণার্থে সবই করিতে হইবে। কিন্তু প্রতি কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে রাখিও তোমার জীবনের শেষ পরিণতি কোথায়? মনে রাখিও তোমার জীবনের লক্ষ্য কি? লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যদি কর্ম্ম করিতে পার তবে কর্ম্ম করিয়া অধিক আনন্দ পাইবে। কর্ম্মজনিত বন্ধন ও দুঃখ থাকিবে না। কর্ম্মই তোমার জীবনের গম্যস্থলে পৌছাইয়া দিবে। লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা আর তোমাকে গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করিবে না। ভারতের ঋষিগণ যে দিব্যপথ তোমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন সেই পথে চল।

তোমরা দেবতাদের চিন্তা কর, দেবতারাও তোমাদের কল্যাণ সাধন করিবেন।

দেবান্ ভাবয়তাঽনেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥

তোমরা দেবতাগণকে সম্বর্দ্ধনা কর, তাহাদের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম কর, যজ্ঞ কর, দেবতাগণও তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। নতুবা বাঁধ বাঁধিয়া দেখিবে প্রবল বন্যায় সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অথবা অনাবৃষ্টির জন্য বাঁধ শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। প্রচুর ফসল উৎপাদন করিলে, কিন্তু পঙ্গপাল আসিয়া তাহা নষ্ট করিয়া দিতেছে। নানাবিধ দৈব দুর্বিবপাকে পদে পদে বাধা পাইতে হইবে যদি না তোমরা দেবতাদের সম্বর্দ্ধনা কর। কাজ ত্যাগ করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিবে একথা বলিতেছি না, কাজের ফাঁকে ফাঁকে সম্বর্দ্ধনা কর, সকাল ও সন্ধ্যায় সম্বর্দ্ধনা কর। ঐ বিশ্বেশ্বরীকে সম্বর্দ্ধনা কর, ঐ জগন্মাতাকে স্মরণ কর। যাঁহার বিশ্বে আসিয়াছ, যাঁহার বিশ্বরূপকে সম্ভোগ করিতেছ তাঁহাকে ভুলিয়া বিপথে চলিও না।

তোমাদের পঞ্চকোষের অধিশ্বরী হইলেন এই মা অন্নপূর্ণা। তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হও, নিবিষ্টমনে তপস্যা কর। আর বার বার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বল—

"অজ্ঞানান্ধ সুতে মাত কৃপয়া দেহি দর্শনম্।"
"মাতরজ্ঞ কৃতঘ্নোঽহং পুত্রস্তে পরমেশ্বরি।"
"কেবলানুভবানন্দ রূপেন পরমেশ্বরি।
আবির্ভূয় পরং ব্রহ্ম কুরু মাং মুক্ত বন্ধনম্॥"
"জ্ঞান-বৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি।
ভিক্ষাং দেহি মে পার্ব্বতি।"

॥ ওঁ শান্তি হরি ওঁ ॥

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা —১৩৬৭

রবীন্দ্র স্মরণে

যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে ধীর ব্যক্তিগণ সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে পাইয়াছিলেন।

তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ
যুক্তাত্মানো সর্ব্বমেবাবিশন্তি।

ঋষিগণও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিত্যযুক্ত অবস্থায় সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন। রবীন্দ্রনাথও সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে স্থাবরে জঙ্গমে, বৃক্ষে পল্লবে, কীটে পতঙ্গে, পশু ও মনুষ্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছিলেন। তাই যখন তিনি সেই ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হইতেন তখন ভৃত্যের অন্তরে কি ব্যথা, প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের উৎপীড়নে দরিদ্র ও বাস্তুহারার অন্তরে কি জ্বালা তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন। একদিকে ধনলুব্ধ হিংসাপরায়ণ একজন ধনের লালসায় ভ্রাতাকে হত্যা করিবার জন্য কতদূর নীচ ও হিংসাপরায়ণ হইতে পারে অপর দিকে বৈরাগ্যবান আদর্শবাদী একজন রাজর্ষি প্রেম ও পবিত্রতায় কত সমুজ্জ্বল হইতে পারে তাহা রবীন্দ্রনাথ তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিয়াছিলেন শিশুদের অন্তরে। তাই শিশুদের মর্ম্মকথা নিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিয়াছিলেন বিদ্রোহী বিপ্লবী দেশপ্রেমিক কিশোর ও যুবকদের অন্তরে। তাই তাহাদের মর্ম্মবেদনার গান রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিয়াছিলেন ভগবৎ ভক্তদের অন্তরের অন্তস্তলে। তাই ভক্তের অশ্রুসিক্ত সুমধুর সঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার

মর্ম্মবীণায়। কুৎসিৎ ও সুন্দর, প্রেমিক ও নিষ্ঠুর সকলের অন্তরেই রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিতে জানিতেন। তিনি যে যোগযুক্ত হইয়াছিলেন; তিনি যে আত্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি যে সেই বিরাট্ ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মকে শুধু নির্গুণ বলিয়া জানেন নাই, অনন্ত গুণ ও বৈভবের উৎস ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন, পাইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বকে জড় বিশ্বরূপে না দেখিয়া ব্রহ্মেরই লীলা বিলাসরূপে দেখিতেন। ব্রহ্মেরই মূর্ত্ত প্রতীকরূপে দেখিতেন। ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী তাই রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন, অভিবাদন করিতেন। শান্তিনিকেতনের নিভৃত আম্র কাননে বসিয়া অন্তরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পরস্পর পরস্পরের মধ্যে এই ব্রহ্মানুভূতির পবিত্র উদ্গাথাই গাহিতেন। বিশ্বের মধ্যে ব্রহ্মকে পাইয়া বিশ্ববাসীর মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া কিরূপে যোগযুক্ত হওয়া যায় এবং মোহমুক্ত হওয়া যায় ইহাই ছিল তাঁহাদের উদ্গাথার মূল কথা। আত্মজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে মহাত্মা গান্ধী দিব্য জগতের প্রেরণা লাভ করিতেন। অগণিত লোকের মধ্যে থাকিয়া ও অনন্ত কর্ম্মের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও কিরূপে ব্রহ্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ থাকা যায় সেই যোগ কৌশল নিয়াই উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইত। বিশ্বপতির সঙ্গে যুক্ত হইয়া বিশ্বের সেবা করিলে মানুষ মোহলিপ্ত হয় না। বরং বিমুক্ত হয়, বিরাট্ হয়। সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও অসঙ্গ থাকেন।

বর্ত্তমান কালের যোগযুক্ত ঋষি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের তপস্যার কেন্দ্রভূমি ছিল শান্তিনিকেতনের আম্র-

কানন। তাঁহার তপস্যার অন্য কেন্দ্রস্থল ছিল নদীর উপকূল। তিনি ধ্যানে অনুপ্রবিষ্ট হইতেন—বিশাল প্রান্তরে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্য্যন্ত ঐ নীল আকাশে স্নিগ্ধ বাতাসে তরঙ্গায়িত নদীতে, উপকূলে, বল্মীকে, বৃক্ষে, ফুলে, ফলে। অন্তর চেতনা যাঁহাদের জাগিয়া উঠে, অন্তর যাঁহাদের জাগিয়া উঠে, দিব্য দৃষ্টি যাঁহারা লাভ করেন তাঁহারা এভাবে প্রবেশ করেন সর্ব্বত্র সকলের মধ্যে।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

গীতার এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন আত্মজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ। স্থানে স্থানে তাঁহার কবিতা হইতে তাঁহার সঙ্গীত হইতে ইহাও আমরা অনুভব করি। তিনি ক্ষণে ক্ষণে গুণাতীত ক্ষেত্রেও অনুপ্রবিষ্ট হইতেন। তবে তিনি অধিকতর তৃপ্তি লাভ করিতেন লীলাময়ের সঙ্গে অন্তরকে যুক্ত করিয়া তাঁহার লীলারস সম্ভোগ করিয়া। বিশ্বপতির রূপে, রসে, গন্ধে তিনি সঞ্চরণ করিয়া, তিনি সন্তরণ করিয়া, তিনি বিহার করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। সর্ব্বদর্শী বিশ্বপিতার সঙ্গে তিনি তাঁহার দিব্য দৃষ্টিকে মিলাইতেন। তাই কীট পতঙ্গের অন্তরেও কি গাথা কি ব্যথা, কি কথা তাহা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিতে পারিতেন। যিনি অণোরণীয়ান, তিনি মহতো মহীয়ান্। তাই রবীন্দ্রনাথ মহতো মহীয়ানের মধ্যেও বিহার করিতে পারিতেন।

রবীন্দ্রনাথকে জানিতে হইলে তাঁহার যোগকৌশলকে জানিতে হইবে। ধ্যানে তাঁহার অন্তরে অন্তরকে মিলাইতে হইবে। নিমেষে নিমেষে তাঁহার চক্ষুতে চক্ষু মিলাইতে হইবে। নিমেষে নিমেষে তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইতে হইবে। তাঁহার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

রবীন্দ্রনাথকে ধ্যান করিলে ব্রহ্মকেই পাইবে। যদি মানুষ-রূপী রবীন্দ্রনাথকে শুধু মানুষরূপেই দেখ, বাহিরের চক্ষু দিয়াই দেখ তবে রবীন্দ্রনাথকে সম্যক্ চিনিতে পারিবে না। যেখান হইতে রবীন্দ্রনাথের গান প্রথম সুর নিয়াছে, যেখান হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রথম ভাবের উন্মেষ হইয়াছে রবীন্দ্র-নাথের সেই মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে হইবে।

দেখ, নিরীক্ষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখ, ভাব, আরও স্বচ্ছ মন দিয়া রবীন্দ্রনাথকে ভাব, তবেই রবীন্দ্রনাথ তোমাদের মধ্যে দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিবেন। তোমরাও রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া সেই ভূমাকে পাইবে, যোগযুক্ত হইবে। 'যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে' সেই নিত্যধামে প্রবেশ করিতে পারিবে।

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা—১৩৬৮।

ভগবান বুদ্ধদেব ও রাহুল

ভগবান বুদ্ধদেব যে সদ্যোজাত শিশুকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন সেই বালক তাহার তপস্বিনী মাতা গোপার স্নেহে লালিত পালিত হইয়া পিতার পথে অনুগমন করিয়া-ছিলেন। রাহুল তাঁহারই নাম। রাহুলও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুদের ন্যায় কঠোর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই মানুষের অন্তর সহসা অহঙ্কার ও রাগদ্বেষ ত্যাগ করিতে পারে না। বুদ্ধদেব লক্ষ্য করিলেন— রাহুলের ব্যবহারে বেশ অসংযত ভাব রহিয়াছে, বুদ্ধের পুত্র বলিয়া সকলেই তাহাকে মর্য্যাদার চক্ষুতে দেখিতেন তাই তাহার অভিমানও যথেষ্ট রহিয়াছে। পুত্রের এইরূপ আচরণ দেখিয়া বুদ্ধদেব তাহাকে এক নির্জ্জন বিহারে প্রেরণ করিলেন। তাহাকে মন ও জিহ্বা সংযত রাখিতে উপদেশ দিলেন। কিছুদিন পর ভগবান বুদ্ধদেব ঐ বিহারে গমন করিলেন। অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে রাহুলও তথাগতকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। রাহুল পিতার চরণ ধুয়াইবার জন্য এক মৃন্ময় পাত্রে পবিত্র জল আনিয়া শ্রদ্ধানত শিরে চরণ ধুয়াইয়া দিলেন। তথাগত জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাহুল! এই জল কি এক্ষণে পেয় ? বালক উত্তর করিলেন—"না প্রভু এই জল দূষিত হইয়াছে।"

ভগবান বুদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—এইবার তোমার কথা চিন্তা কর—যদিও তুমি আমার পুত্র, রাজার পৌত্র এবং এই বাল্যকালেই সর্ব্বত্যাগী শ্রমণ হইয়াছ তথাপি তুমি নিজের জিহ্বাকে ও মনকে অপবিত্র করিয়া দিনে দিনে কলুষিত হইতেছিলে। পবিত্র জল যেমন পা ধুয়াইলে মলিন হয়, পবিত্র জীবনও সেইরূপ অসৎ বাক্য ও অসৎ চিন্তা দ্বারা মলিন হয়।

বুদ্ধদেব পুনরায় বলিলেন—যে পাত্রে এই অপবিত্র জল রাখিয়াছ তাহা কি অন্য কাজে ব্যবহার করা চলে ? রাহুল বলিলেন—অপবিত্র জল রাখায় এই পাত্রটীও অপবিত্র হইয়াছে। ইহাতে অন্য জিনিষ রাখিতে হইলে প্রথমে অপবিত্র

জল ফেলিয়া পাত্রটি পবিত্র জল দিয়া পুনরায় ধুইতে হইবে।

ভগবান বুদ্ধদেব পুনরায় রাহুলকে বলিতে লাগিলেন—অসংযত চিন্তা ও বাক্যদ্বারা তোমার দেহরূপ পাত্রটী এই অপবিত্র পাত্রের ন্যায়ই দূষিত হইয়াছে। তুমি পবিত্র শীল সকল পালন করিয়া প্রথম মন ও জিহ্বাকে পবিত্র কর তবেই তথাগতের প্রেম ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিবে।

ভগবান বুদ্ধদেব সেই মাটীর পাত্রটী উপরে উঠাইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন এবং রাহুলকে, জিজ্ঞাসা করিলেন—এই পাত্রটী ভাঙ্গিয়া যাওয়ার আশঙ্কা কর কি? রাহুল উত্তরে বলিলেন—পাত্রটী সুলভ বস্তু। ইহা ভাঙ্গিয়া গেলেও বিশেষ কিছুই ক্ষতি হইবে না।

বুদ্ধদেব আবার বলিতে লাগিলেন—এখন তোমার বিষয় চিন্তা কর। তোমার দেহটী যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে জগতের বিশেষ কিছুই ক্ষতি হইবে না, ইহা এই মাটীর পাত্রের ন্যায়ই সুলভ ও ক্ষণভঙ্গুর। ইহাতে পবিত্র জিনিষ রক্ষা করিলেই গৌরব বৃদ্ধি হইবে। অপবিত্র জিনিষ রক্ষা করিলে অপবিত্র জল রক্ষিত এই মৃন্ময় পাত্রের ন্যায় ঘৃণার বস্তু হইবে। অসত্যবাদী ঘৃণার পাত্র। অসৎ-চিন্তাই দেহকে কলুষিত করে।

এইবার রাহুল লজ্জিত হইলেন। তিনি শান্ত ও সুসংযত হইতে যত্নবান হইলেন। ধ্যাননিষ্ঠ তপস্বী হইলেন।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা—১৩৬৮।

বলিদাও, বলিদাও

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

যদি বলি দিতে আশ
স্বার্থ কর নাশ
বলি দাও ষড় রিপুগণে

যাঁহারা মায়ের নামে ছাগল ও মহিষ প্রভৃতি বলি দেন তাঁহারা তামসিক ভক্ত। অজ্ঞ ও অনার্য্যদিগকে ধর্ম্মপথে আনিবার জন্য এরূপ বলির ব্যবস্থা আছে সন্দেহ নাই কিন্তু আত্মার যথার্থ কল্যাণ মেষ, মহিষ ও ছাগলছানা বলি দিয়া হইবে না। তপস্বী রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—ষড়রিপুকে বলি দাও। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এই ছয়টী হইল মানুষের রিপু বা শত্রু। ইহার মধ্যে তিনটী প্রধান; কাম, ক্রোধ ও লোভ। মানুষকে নরকগামী করে এই তিনটী রিপুই বিশেষভাবে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ —গীতা॥

কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী নরকের দরজা। এই তিন রিপু মানুষের মনের সঙ্গে একান্তভাবে মিশিয়া যাইয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে বিপথে পরিচালিত করে। বালকের কামবৃত্তি নাই—যৌবন আসিলে কাম বৃত্তি আসিয়া শুধু মানুষকে কেন, ইতর জন্তুকেও পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। ক্রোধের কারণ ঘটিলে কোন্ অজ্ঞাত স্থান হইতে এই ক্রোধ অলক্ষ্যে আসিয়া মনে

প্রবেশ করে তাহা অনেকেই জানিতে পারে না। লোভের কারণ যেখানে নাই তথায় অনেকেই নিজেকে নির্লোভ ভাবে কিন্তু দেখা যায় লোভের বস্তু সামনে আসিলেই তাহাতে লুব্ধ হয়। এই বৃত্তি সকল আকাশে থাকে, না বাতাসে থাকে ইহা কেহই ভাবিয়া দেখে না। এই চিন্তাশক্তি যাহাদের নাই তাহারাই জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে পারে না। বাহিরের মেষ মহিষকে বলি দিয়া তাহারাই উল্লসিত হয়, নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে। কিন্তু হায়, অন্তরের অরণ্যে যাহাদের শত শত হিংস্র জন্তু রহিয়াছে এবং একটু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই যে সকল হিংস্র জন্তু অন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া আক্রমণ করে, তাহাদিগকে যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে না পার এবং বলি না দিতে পার তবে জীবনে কিরূপে শান্তি পাইবে বল? বাহির বিশ্বের ন্যায় অন্তরেও রহিয়াছে এক বিরাট্ বিশ্ব। বাহিরের বিশ্বে যেমন সুরভিত ফুলের এবং সুমিষ্ট ফলের বাগান হয়, তেমনি অন্তরের জগতেও নন্দন কানন সৃষ্টি হইতে পারে। বাগান করিতে হইলে আবাদের প্রয়োজন। আবাদবিহীন ভূমি অরণ্যে পরিণত হয়। কণ্টকাকীর্ণ হয়। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

“এমন মানব জীবন রইল পড়ে
আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা।
মন তুমি কৃষিকাজ জানো না।”

মৃত্যুকালে বাহিরের জগৎ বাহিরেই পড়িয়া থাকে, কিন্তু অন্তরের জগৎ সাথে সাথে চলে। তাই যাহারা চিন্তাশীল তাহারা বাহির হইতে দৃষ্টিকে অন্তরে ফিরাইয়া ধরে; অন্তরের বাগান তাহারা কণ্টকবিমুক্ত করিতে যত্নবান হয়। হিংস্র

শ্বাপদগুলিকে সেই বন হইতে বিতাড়িত করিয়া দেবালয় প্রতিষ্ঠা করে, অন্তরে দেবতাকে বসায়; অসুরবৃত্তি সকলকে বিমর্দ্দিত করে। সেই অন্তরের মন্দিরে দেবতার বেদীমূলে বলি দেয় অন্তরের পশুগুলিকে।

তোমরাও দীর্ঘদিন মায়ের পূজা করিয়াছ, মা মা বলিয়া ডাকিয়াছ। কেহ কেহ অন্তররাজ্যের সন্ধানও পাইয়াছ। অতি বীভৎস, অতি ভয়াবহ অন্তরের এই কণ্টকাকীর্ণ গুপ্ত গুহা। যুগ যুগান্তর প্রদীপ এই গুহায় জ্বলে নাই, গুহার গুপ্ত অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদকুল আশ্রয় লইয়াছে। গুরু জ্বালিয়া দেন ঐ গুপ্ত গৃহে প্রদীপ, দেখাইয়া দেন অন্তরের পথ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালিয়া নিশা অবসানে মঙ্গল-আরতি করিতে হয় ঐ গুপ্ত গুহায়। শ্বাপদকুল ভীত হয়, মঙ্গল-আরতির মাঙ্গলিক ধ্বনি শুনিয়া। ধীরে ধীরে মন্দির গড়িয়া উঠে, ধীরে ধীরে দেবতার প্রতিষ্ঠা হয় ঐ গুপ্ত গুহায়। কণ্টকাকীর্ণ সেই বিজন কানন নন্দন কাননে পরিণত হইতে থাকে। কিন্তু হায়, বহুজন্ম যে শ্বাপদকুল অন্তরের গুহায় বাস করিয়াছিল তাহারা সহসা তাহাদের বাসগৃহের মমতা ত্যাগ করিতে পারে না, ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে নাতিদূরে। অলক্ষ্যে ক্ষণে ক্ষণে আক্রমণ করে দেবালয়, পরাস্ত হয় সাধক। ইহাই জীবন-যুদ্ধ। যাহারা এই রণক্ষেত্রে একবার অবতীর্ণ হইয়াছে তাহারা জানে কত বাধা কত বিপত্তি কত ঘাত-প্রতিঘাত এই রণক্ষেত্রে!

বলবান শত্রুর সঙ্গে সন্ধি বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না। অন্তরের বলবান রিপুকুলের সঙ্গেও মৈত্রীভাব বহুক্ষণ থাকে না। সুযোগ সন্ধানী অন্তরের শত্রুকুল প্রতিক্ষণই প্রতীক্ষা করিতে থাকে

অতর্কিতে আক্রমণ করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া। কামের বস্তু একটু লক্ষ্য পথে আসিলেই সে অন্তরে, শুধু অন্তরে নহে, দেহে মনে প্রাণে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ক্রোধের কারণ ঘটিলে অতি হিংস্র পশুর ন্যায় রক্তে স্নায়ুতে প্রবেশ করিয়া ক্রোধান্ধ করিয়া ফেলে। লোভ অহরহ লুব্ধ শৃগালের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায় অন্তরের দেব-দেউলের চতুর্দ্দিকে। ছিদ্রান্বেষী এই লুব্ধ শৃগাল অলক্ষ্যে প্রবেশ করে অন্তরের প্রাঙ্গণে। মনকে করে বিষাক্ত, ইন্দ্রিয়কুলকে করে প্রলুব্ধ, দেহে আসে তমোগুণের উদ্দীপনা। অসহায় মানুষ দিগ্‌ভ্রান্ত হয়—বহুবার বহুদিন বহু-বৎসর বহুজন্ম এই যুদ্ধের অভিনয় চলে অন্তর-রাজ্যে। বাহিরের পশু বলি দিয়া অন্তর-রাজ্যের এই যুদ্ধের শেষ হয় না তাই তপস্বী গাহিলেন—

"বলি দাও ষড় রিপুগণে।"

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"তস্মাদ্ এতদ্ ত্রয়ং ত্যজেৎ।"

ষড় রিপুকে বলি দাও, নরকের এই তিনটী দরজাকে ত্যাগ কর। অন্তরের হোমাগ্নি জ্বালিয়া পূর্ণাহুতি দাও—

'পূর্ণাহুতি দিব তাহে
জয় কালী জয় কালী বলি।'

জ্ঞান খড়্গে বলি দাও, অন্তরের হোমাগ্নি জ্বাল ঐ দেব-দেউলে—ঐ অন্তরের নিভৃত কক্ষে, যেখানে ছিল বিজন বন—যেখানে ছিল শ্বাপদকুল, সেইখানে—সেই বনে—সেই কণ্টকাকীর্ণ বনে দাবানল জ্বাল, হোমবহ্নি জ্বাল। আর সেই বহ্নি শিখায় আহুতি দাও। বহ্নির দীপ্তিতে দেখিয়া লও অন্তরের

দেবতাকে, বলি দাও ঐ দেবতার পাদমূলে একে একে রিপুগণকে। দুর্গা দুর্গা বল, কালী কালী বল, আর বলি দাও। কণ্টকে রক্তসিক্ত, শ্বাপদ-দংশনে বিষাক্ত তোমার ঐ অন্তর জগৎ। তবু ভয় কেন এত, ওহে শিশু, চির রক্তাক্ত তুমি। অরিকুলের দংশনে চির রক্তাক্ত তুমি। দেখ, নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, কত মোহ এখনও রহিয়াছে তোমার ঐ রিপুকুলের প্রতি। কত প্রীতি, কত ভালবাসা ঐ কাম ক্রোধ লোভের প্রতি। তাই হোমবহ্নি জ্বলিয়াও জ্বলে না, তাই জ্ঞান খড়্গ স্খলিত হয় শিথিল মুষ্টি হইতে। জয় দুর্গা বল, দুর্গা দুর্গা বল, ত্রাহি মাং রক্ষ মাং বল। হোমবহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে—অন্তরে বল পাইবে, বাহুতে মা শক্তি সঞ্চার করিবে।

ষষ্ঠীতে অন্তর-রাজ্যে মায়ের বোধন করিয়াছ, অধিবাসও করিয়াছ, সপ্তমীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছ, মহাষ্টমীতে ঐ অন্তরের দেব-দেউলে মা'কে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছ, সন্ধি পূজাও করিয়াছ, কিন্তু হায়, জীব ও পরমের সন্ধি হইল না। আবার ফিরিয়া আসিলে মনে ইন্দ্রিয়ে দেহে, আবার ফিরিয়া আসিলে সুপ্ত কাম ক্রোধ লোভ ও মোহের কণ্টকাকীর্ণ বনে। ওরে বলি দাও, সন্ধিপূজায় বলি হয় নাই, জীব ও পরমের মিলন হয় নাই। তাই মহানবমীতে ঐ জ্ঞান-খড়্গে বলি দাও। মায়ের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দাও, নিজেকে অসহায় ভাবিয়া মাতৃচরণে উৎসর্গ কর। তবেই দেখিবে, যে বলি তুমি দিতে পার নাই সে বলি মা দিতেছেন। পারিবে কি শিশু, মায়ের হাতে নিজেকে অর্পণ করিতে? পারিবে কি শিশু, মায়ের হাতে খড়্গ তুলিয়া দিতে? এ যে বড় কঠিন সাধনা! তোমার অহংকে যে এখনো বলি দাও নাই। তাই মা তোমার অস্ত্র তুলিয়া

লইবে না, তাই মা তোমার ভার গ্রহণ করিবে না। 'নিবেদয়ামি চাত্মানং' মুখে শতবার বলিয়াছ, অন্তর হইতে বলিতে পার নাই। অহংকেই ত' দংশন করে ঐ রিপুকুল—অরিকুল। যাহার অহং নাই তাহার রিপুও নাই। সে ত' মাতৃক্রোড়স্থিত নগ্ন শিশু। "ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ"। সেই মা'কে ভয়ে তপস্যা করে সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ। আত্মপ্রবঞ্চনা করিও না, মায়ের হাতে সমর্পণ করিয়াছ বলিয়া নিজেকে নিজে প্রবঞ্চনা করিও না। তোমার গর্ব্বিত অহং এখনও প্রণত হয় নাই। তাই বলি—বলি দাও, বলি দাও। 'জয় দুর্গা' বলিয়া 'দুর্গে দুর্গে রক্ষ মাং' বলিয়া বলি দাও। বলি দাও—কামং জুহোমি, ক্রোধং জুহোমি, লোভং জুহোমি স্বাহা বলিয়া। দুর্গে দুর্গে রক্ষ মাং, দুর্গে দুর্গে ত্রাহি মাং বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহুতি দাও।

প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ পুত্র বৎসলে
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে
দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে—

—বলিতে বলিতে প্রণত হও, লুণ্ঠিত হও। নিজের দেহ মন প্রাণকে প্রসাদ করিয়া লও, প্রসাদ করিয়া লও তোমার সব কিছু। আর বারবার—শতবার, সহস্রবার লুণ্ঠিত হইয়া বল—

প্রসাদং কুরু মে দেবি
দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥
ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা—১৩৬৮।

আমি আসি

(১৩৬৮ সাল জন্মাষ্টমী)

শ্রীভগবান বলিলেন—'আমি আসি।' 'সম্ভবামি যুগে যুগে।' 'আমি আসি' এই কথাটির দ্বারা তিনি জানাইতেছেন —আমি এখানে থাকি না। যখন আমার প্রতিষ্ঠিত ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই আমি এখানে আসি। তোমাদের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে ভাসিয়া রোগ শোক ও দুঃখ ভোগ করিবার জন্য আমি আসি না। সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিতে এবং দুষ্কৃতিশীলদিগকে বিনাশ করিতে আমাকে আসিতে হয়। আমার প্রচারিত ধর্ম কালপ্রবাহে নষ্ট হয়, মলিন হয়, তখনই আমি আসি আমার যোগধর্মকে আবার বুঝাইবার জন্য। মোহাচ্ছন্ন জীব, তোমরা জান না কতবার এই জগতে আসিয়াছ এবং সুখ দুঃখের আবর্ত্তনে ঘুরিতেছ। আমি তাহা জানি। 'তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।' তোমরা প্রকৃতির অধীন হইয়া জগতে আস, কারণ তোমরা প্রকৃতির দাস। আর আমি প্রকৃতির অধ্যক্ষ। আমার নির্দেশেই প্রকৃতি চলে। সেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমি ধরাধামে আসি। আমার নির্দেশেই প্রকৃতি সব সৃষ্টি করিয়া থাকে। 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।' আবার দেখ, আমি শুধু প্রকৃতির আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে প্রতি বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়াও রহিয়াছি। তোমরা বিশ্বে

শুধু প্রকৃতিকেই দেখ, আমাকে দেখ না। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"—আমাকে দেখিলে প্রকৃতির আবরণ—মায়ার আবরণ অপসৃত হয়।

"রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।" আমি জলে রস, চন্দ্রে ও সূর্যে জ্যোতি। আবার আমিই সকলকে একই সূত্রে আমার মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। "সূত্রে মণিগণা ইব।" আমি সূত্র, অনন্ত রূপ আমারই মালার পুষ্প। আমিই আবার নানা রূপে ও নামে জগৎ-সাজে সাজিয়াছি। অমৃত ও মৃত্যুরূপে এবং সৎ ও অসৎ রূপে যাহা আছে তাহা আমিই; অন্য কেহ নহে। "অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন।" আমিই আধার ও আধেয়। আকাশে যেমন বায়ু থাকে সেইরূপ আমাতেই সব অবস্থান করিতেছে। ইহা আমার জগৎ লীলার পরিচয়। কিন্তু আমার একটি পরম ধামও আছে, যেখানে সূর্য, চন্দ্র কেহই প্রবেশ করিতে পারে না। "ন তৎ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।" সেই ধামেই আমি থাকি। "সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" সকলে হৃদয়ে—দহরে আমি নিত্য থাকি। দহরেই আমার নিত্য ধাম। তোমরা তপস্যার প্রভাবে একবার আমার সেই ধামে পৌঁছিতে পারিলে আর তোমাদের পুনরাবর্ত্তন হয় না। "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" সেখানে দুঃখ নাই। আনন্দই আমার স্বরূপ, আনন্দেই পরিপূর্ণ আমার সেই পরম ধাম।

আমি আমার পরমধামে তোমাদের বুদ্ধিরও পরপারে সকলের দহরে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান রহিয়াছি। আবার নিকটেও রহিয়াছি। 'দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।' দূরে ও নিকটে একমাত্র আমিই রহিয়াছি। আমার সেই আনন্দধাম হইতে—

সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ হইতে আমি নামিয়া আসি এই মূর্ত্ত বিশ্বে। আনন্দধাম হইতে আমি আসি যুগে যুগে এই অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ জগতে, তোমাদিগকে আনন্দধামের পথ দেখাইতে এবং এই মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিতে। কিন্তু হায়! মানুষ তোমরা, আমি মানুষের রূপ ধরিয়া তোমাদের মধ্যে আসিলেও আমাকে চিনিতে পার না, বরং অবজ্ঞা কর। যেমন আমার বিশ্বরূপে আমাকে দেখিতে পাও না, তেমনি আমার মনুষ্যরূপেও আমাকে দেখিতে পাও না। অবজ্ঞা কর, ঘৃণা কর। তবু আমি আসি। আমি না আসিলে, আমার কথা আমি না বলিলে, আমার মহিমা আমি প্রচার না করিলে তোমরা যে একেবারে রাক্ষস ও অসুরতুল্য হইয়া যাইবে। আমি আসি বলিয়া—শুধু বসুদেবের পুত্র বাসুদেবের মূর্ত্তিই আমি নহি। এত ছোট দৃষ্টি দিয়া আমাকে দেখিও না। দেখ—"বাসুদেব সর্ব্বমিতি।" বাসুদেবই সব। আমিই সকলের মধ্যে, আবার আমিই সকল আকারে আকারিত। আমি বিশ্বের আদি মধ্য ও অন্ত। আমাকে সর্ব্বত্র দেখ, সকলের মধ্যে দেখ। আমার ঐ লীলায়তন দেহটি নিত্য নহে, এই বিশ্বও নিত্য নহে, কিন্তু ইহা নিত্যেরই অভিব্যক্তি। লীলার মধ্যেও আমার নিত্য আবির্ভাব দেখ। নিত্য আমি—আমার দিব্য ধাম হইতে লীলাময় হইয়া এই জগতে আসি। আমি নিত্য। আবার আমিই অনিত্য জগতের পিতা মাতা ধাতা বিধাতা।' শ্রদ্ধাবান হও, ভক্তিতে প্রণত হও। আমার ধ্যান কর, আমার পূজা কর, পুনঃ পুনঃ আমাকে প্রণাম কর, মায়ার বাঁধন ছিন্ন হইবে। আমাকে জান, আমাকে দেখ, আমাতে প্রবেশ কর।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর। আমার পূজায় নিবিষ্ট হও। আমাকে প্রণাম কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—এই-ভাবে তুমি আমাকে পাইবে। তুমি যে আমার অত্যন্ত প্রিয়।

ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

শোন—আবার বলিতেছি—আমি স্বীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া মানুষ আকারে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমিই সূত্রাকারে এই বিশ্বকে মালার ন্যায় গাঁথিয়া রাখিয়াছি। আমিই সৎ, আবার আমিই অসৎ। আমি বিশ্বসাজে সাজিয়াছি এবং অনন্তরূপে সাজিয়াও আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত রহিয়াছি। আমিই অনন্তরূপে, অনন্ত গুণে রূপায়িত গুণান্বিত হইয়াও স্বরূপতঃ নির্গুণই রহিয়াছি। আমাকে তত্ত্বতঃ জান, আমার পরম ভাবটি জান, আমাতে প্রবেশ কর। 'বিশতে তদনন্তরম্।'

তোমরা যেমন দেহ, ইন্দ্রিয় ও জগৎকে প্রথম সর্ব্বস্ব ভাবিয়া লও এবং জগৎকেই সত্য নিত্য বল, তেমনি সাধন জগতে প্রবেশ করিয়া বিশিষ্ট কোন মূর্ত্তিকেও সত্য বল এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে আবদ্ধ হও। ইহাতে ধর্ম্মের গ্লানিই হয়। তোমরা ভুলিয়া যাও—

যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক অন্য দেবতার পূজা করে তাহারা আমারই পূজা করিয়া থাকে, কারণ "মত্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়ঃ।" আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা আমাকে বাদ দিয়া অন্য

কিছু জগতে নাই, থাকিতে পারে না। শুধু বিশিষ্টরূপে নহে, রূপে রূপে প্রতিরূপে আমাকে দেখ। দুর্গা শিব কালী গণেশ বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি রূপে আমিই পূজা গ্রহণ করি। নামে নামে প্রতি নামে আমারই নামামৃত পান কর। ভাবে ভাবে প্রতিভাবে ভাবময় আমাকে অনুভব কর। সকল গুণে, সকল নামে, সকল রূপে, সকল ভাবে আমি চির বিদ্যমান। দূরে আমাকে খুঁজিও না, চক্ষু বাঁধিয়া অন্ধ সাজিও না। আমাকে দেখিলে আমি নয়নের মণিতে আসি। আমাকে ভাবিলেই আমি তোমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হই। আমার নাম জপ করিলেই আমি অনাহত ধ্বনি শুনাই। আমার এই নিত্য আবির্ভাব দেখ। বিশিষ্ট আবির্ভাব যুগে যুগে হয়, কিন্তু আমার নিত্য আবির্ভাব ভক্ত তোমাদের সম্মুখে প্রতি পলে পলে হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম ত্যাগ কর। বিষয়ের তৃষ্ণা ত্যাগ কর। সর্বত্র আমাকে দেখ—"মামেকং শরণং ব্রজ।" ধর্ম বহু নহে, ধর্ম এক। ভগবান বহু নহে, ভগবান এক। বহুর মধ্যে এক আমি চির বিদ্যমান। সেই আমিই আবার আসি যুগে যুগে তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে। দিব্য দৃষ্টি লাভ কর। তপস্যা কর, তপস্যা কর। প্রণাম কর, প্রণাম কর।

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণুরমর্দনম্
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্!
কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্॥
ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা—১৩৬৮।

কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ

দেহধারী জীবমাত্রেই কর্ম্মের অধীন। কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও কেহ থাকিতে পারে না। 'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।' ইতর জন্তু হইতে আরম্ভ করিয়া, এমন কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতাগণ পর্য্যন্ত কর্ম্মের অধীন। বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণ দৈহিক কর্ম্ম করিতে না পারিলেও মানসিক কর্ম্ম হইতে (চিন্তা হইতে) বিরত হইতে পারে না। অথচ এই কর্ম্মই বন্ধন। কর্ম্মের পরিসমাপ্তি কোথাও নাই। কর্ম্ম হইতেই জন্ম, জন্মই দুঃখের কারণ। ইহাই যদি জগতের বিধান হয় যে কর্ম্ম করিতেই হইবে অথচ কর্ম্মের পরিসমাপ্তি কোথাও নাই এবং কর্ম্ম হইতেই জন্ম হইবে, জন্ম হইতেই সুখ দুঃখের অভিঘাত সহ্য করিতে হইবে; তাহা হইলে মানুষ সত্যই বড় অসহায়। মুক্তি বলিয়া, পরম আনন্দ লাভ বলিয়া যে কথা প্রচলিত রহিয়াছে তাহার কোনই সার্থকতা থাকে না। জীব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হইল শান্তিলাভ অর্থাৎ মুক্তিলাভ। মুক্তি মানেই বাসনা হইতে মুক্তি, কর্ম হইতে মুক্তি, জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্তি।

উপনিষদের ঋষিগণ প্রথমে এই মুক্তির উপায় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের বাস্তব জীবনেও কি উপায়ে চলিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় সেই পথও দেখাইয়া গিয়াছেন। উপনিষদের সেই আদর্শবাদই পুনরায় প্রচার

করিয়াছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গীতার বাণীতে—

সর্বোপনিষদো গাবো·········দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

উপনিষদ্ সকল গাভী, গীতা হইল অমৃতময় দুগ্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাও বলিয়াছেন কালের প্রভাবে আদর্শবাদ নষ্ট হইয়া যায় তাই আমি পুনঃ পুনঃ আসি এই পৃথিবীতে—

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ।
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ॥

সেই পুরাতন যোগের কথাই তোমাদিগকে আবার বলিতে আসিয়াছি। শুধু বলিতে আসি নাই, আমার কর্মময় জীবনের দ্বারা কিরূপে নিষ্কাম কর্ম করিয়া পরম শান্তি লাভ করা যায় তাহা দেখাইতেও আসিয়াছি। ত্রিভুবনে আমার কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু নাই, তবু আমি কর্ম করিতেছি। যদি আমি কর্ম না করি তাহা হইলে তোমরা আদর্শ পথের সন্ধান পাইবে না। শুধু আমি নহি—ব্রহ্মবিদ্ জনকাদি ঋষিগণও নিষ্কাম কর্ম করিয়া তোমাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রধানতঃ কর্মকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—কর্ম ও অকর্ম। (অবশ্য বিকর্ম্ম বলিয়াও একটি কথা গীতায় আছে। বিকর্ম মানে—নিষিদ্ধ কর্ম—পাপ কর্ম।)

কর্মণি অকর্ম যঃ পশ্যেদ্ অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
সঃ বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সঃ যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্মকৃৎ॥

সাধারণ মানুষ যে কর্ম করে তাহা কর্ম। আর যোগীরা যে কর্ম করে তাহাই অকর্ম। সাধারণ মানুষ যাহা করে সেই কর্মের দ্বারা তাহার আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়ে, কাম ক্রোধ লোভ বাড়ে। এই কাম ক্রোধ ও লোভই নরকের পথে—দুঃখের পথে নিয়া যায়। যোগীগণ যে কর্ম করে তাহাতে আকাঙ্ক্ষা

বাড়ে না, অনুরাগ ও বিদ্বেষ থাকে না। অন্তর অনাসক্ত হয়, অন্তরে আসে এক অনাবিল শান্তি, বিষয়ে আসে বিতৃষ্ণা। কর্ম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাস হয় না। যোগ বিহীন যে সন্ন্যাস তাহা দুঃখেরই কারণ হয়।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুম্ অযোগতঃ।

কর্ম ত্যাগ করিয়া তথাকথিত সন্ন্যাসের দ্বারা আত্মকল্যাণ হয় না। ইহা শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ-ই গীতায় বলিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে কর্ম করিয়াও মুক্তি পাওয়ার উপায় নাই। কর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে না। তাহা হইলে মুক্তি লাভের উপায় কি?

উপায় হইল—কর্মকে অকর্ম বলিয়া দেখ আর অকর্মকে কর্ম বলিয়া গ্রহণ কর। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যে ভাবে কর্ম করে তুমি সে ভাবে কর্ম করিও না। তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কর্ম কর। প্রশ্ন হইবে, ঈশ্বরকে কোথায় পাইব? উত্তর—ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে আছেন—তোমার হৃদয়েও আছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুনো তিষ্ঠতি।

প্রত্যেকের হৃদয়ে, দহরে, চিদাকাশে তিনি চির-বর্তমান। তবু জীবসকল তাঁহাকে দেখিতে পায় না। দেখিতে পাওয়ার উপায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

আরও বলিলেন—তুমি যাহা যাহা কর তাহা আমাতে অর্পণ করিয়া কর। হৃদয়ে আমাকে দেখিতে পাও না? আমার একটি কল্পিত রূপকে আশ্রয় কর—সেই রূপের মধ্যে আমি বিদ্যমান ইহা দেখিতে অভ্যাস কর। রূপের উপাসনা হইতে অরূপের সন্ধান পাইবে। অরূপ বিশ্ব হইতেই আমি রূপময় হইয়া আসি,

এই বিশ্বের অনন্তরূপ আমারই রূপ। আমি বিশ্বের আদি মধ্য ও অন্ত।

অহং আদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানাম্ অন্ত এব চ।

আমার একাংশেই জগৎ অবস্থিত। তবু আমাকে তোমরা দেখিতে পাও না? তাই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। বিভিন্ন ভক্তের কাছে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করি। কখনও কৃষ্ণ, কখনও শিব, কখনও দুর্গা প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে আমিই অবতীর্ণ হই। তোমাদের যে রূপটী ভাল লাগে সেই রূপটী গৃহে স্থাপন করিয়া আমার আরাধনা আরম্ভ কর। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, আবার সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত যাহা কর তাহা গৃহ-দেবতা আমাকে স্মরণ করিয়া করিতে যত্নবান হও। এই স্মরণ ও মনন হইতেই পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়। দেখিতে পাই কোন কোন ভাগ্যবান সাধক নূতন গাছের নূতন আমটি আমাকে নিবেদন করিয়া তবে পুত্র কন্যাকে ঐ গাছের ফল আহার করিতে দেয়। বৎসরে বৎসরে নূতন ফল ফুল ও সব্জী যাহা বাজারে আমদানী হয় বা গৃহে উৎপন্ন হয় তাহাও প্রথম আমাকে নিবেদন করিয়া তবে প্রসাদ রূপে তাহা গ্রহণ করে। ঐ গৃহদেবতা আমি—তোমাদের নিবেদিত বস্তুতে দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করি ঐ প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির মধ্যে থাকিয়া। আমার সে প্রসাদ লাভ করিয়া তুমি অন্তরে প্রসন্নতা লাভ কর। তোমার কাম লোভ প্রভৃতি সংযত হয়। প্রভাতে উঠিয়া কেহ কেহ প্রথম আমাকেই স্মরণ কর। চলিতে যাইয়া সামনে ডাইনে বাঁয়ে আমাকেই স্মরণ কর। কেহ কেহ শ্বাসে প্রশ্বাসে আমার নাম জপ কর। আহার করিতে যাইয়া তোমার মুখে অন্ন দিলেও তাহা তোমার অন্তরে অবস্থিত আমাকেই নিবেদন

কর। তোমার হৃদ্দেশে থাকিয়া তোমার মুখ দিয়া আমিই তাহা গ্রহণ করি। স্নান করিতে যাইয়া তোমার দেহকে আমারই সিংহাসন বলিয়া মনে কর। তাই দেহ হইতে কাম ক্রোধ লোভ চলিয়া যায়। আমাকে নিবেদন করিয়া আহার গ্রহণ কর বলিয়া তুমি উর্দ্ধলিঙ্গ ও বিরূপাক্ষ হও। সাধারণ মানুষ ভোগ্যবস্তুকে যে ভাবে দেখে, নিজেই প্রভু সাজিয়া যে ভাবে গ্রহণ করে, তুমি সেইভাবে গ্রহণ কর না। তুমি তোমার গৃহদেবতারূপে অধিষ্ঠিত আমাকে দেখ—তুমি তোমার হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত আমাকে দেখ—তাই তুমি বিরূপাক্ষ।

এই বিরূপাক্ষ তপস্বিগণই ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় আমার হিরণ্ময় রাজ্যে, যে রাজ্যে কোন দুঃখ প্রবেশ করিতে পারে না। যে রাজ্য হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না। কোন বাসনা কামনা সেই দিব্য রাজ্য হইতে এই মর্ত রাজ্যে তোমাকে আর আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে না। শুধু গীতা পাঠ করিলেই জীবন ধন্য হইবে না। শুধু গীতা আসনের উপর স্থাপন করিয়া ফুল জল দিলেই জীবন ধন্য হইবে না। জীবনে গীতার বাণীকে স্থান দিতে হইবে। কর্মের মধ্যে গীতার বাণীকে স্থান দিতে হইবে। এই কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুজীকে একটি পুরাতন গ্রন্থ উপহার দেন। নেহেরুজী জিজ্ঞাসা করিলেন এই গ্রন্থদ্বারা কি হইবে? পণ্ডিতগণ বলিলেন এই গ্রন্থের পূজা করিলে মুক্তি লাভ হইবে। বাস্তববাদী পণ্ডিত নেহেরু পণ্ডিতদিগকে বলিলেন —আমি মুক্তিও চাহি না, এই বইয়ের পূজাও করিতে চাহি না।

পূজা মানেই বাণীকে জীবনে রূপ দান করা, তাহা গ্রন্থেরই হোক্ আর কোন দেব বিগ্রহেরই হোক্। বাণী শুনিয়া, আদর্শ

জীবনের আদর্শ কথা শুনিয়া তাহা জীবনে রূপ দিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রপাঠের মূল কথা। নতুবা শাস্ত্র অধ্যয়ন গর্দভের চিনি বহনের ন্যায় একটি বাহ্যিক কর্ম মাত্রই হইবে। গর্দভ চিনি বহন করিয়া চিনির স্বাদ বুঝিতে পারে না। শাস্ত্রবাক্য কণ্ঠস্থ করিয়া যাহারা জীবনে শাস্ত্রবাক্যকে রূপদান করে না তাহারা শাস্ত্রবাক্যের রসস্বাদন করিতে পারে না। শাস্ত্রবাক্যের রস আস্বাদন করিতে করিতে সেই দিব্য রসের সন্ধান পাওয়া যায়। দিব্য রসের সন্ধান পাইলেই বিষয় রসের প্রতি আসক্তি কমিয়া যায়।

রস বর্জ্জ রসোঽপ্যস্য পরংদৃষ্ট্বা নিবর্ততে

ইহা বিকলাঙ্গ ব্যক্তির বিষয়-রস ত্যাগ নহে। বিকলাঙ্গ ব্যক্তি বিষয়-রস সম্ভোগ করিতে না পারিলেও অন্তরে তাহার লালসা থাকে। সে মিথ্যাচারী, অতিবাদী। মায়ের পূজা করিতে যাইয়া অথবা কোন দেব দেবীর পূজা করিতে যাইয়া যে পুরোহিত বা পূজক মায়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া উপকরণ ও উপ-ঢৌকনের দিকে লক্ষ্য রাখে সে মিথ্যাচারী। দৃষ্টি তাহার বিষয়ে —দৃষ্টি তাহার উপঢৌকনে। সে বিকলাঙ্গ অপেক্ষাও অধিক-তর মিথ্যাচারী। যে অহংকারের বশবর্তী হইয়া পূজার উপচার সংগ্রহ করে সে তাহার অহং-এরই সেবা করে। তাহার প্রদত্ত উপঢৌকন উচ্ছিষ্ট বস্তুর ন্যায় দেবতার সেবায় লাগে না। সেও বিকলাঙ্গ মিথ্যাচারী অপেক্ষা অধিকতর মিথ্যাচারী। তোমরা নিজেকে বিচার কর, বিশ্লেষণ কর, মিথ্যাচারী হইও না। জান— বিদুরের ক্ষুদ্ গ্রহণ করিয়াও তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। জান—শবরীর ফল গ্রহণ করিয়াও তিনি তৃপ্তোঽস্মি বলিয়া-ছিলেন। জান—দ্রৌপদীর প্রদত্ত কণামাত্র উচ্ছিষ্ট শাকান্ন গ্রহণ

করিয়াও তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

প্রণত হইতে শিক্ষা লাভ কর। ঐ অহংকারকে—ঐ নিজের ইচ্ছাকে প্রথম তাঁহার শ্রীচরণে ধীরে ধীরে নিবেদন কর। তাঁহাকে সকল অপেক্ষা প্রিয় ভাব। ঐ গাছের ফুলটি ফলটি, ঐ বৃক্ষের পাতাটি, ঐ জলাশয়ের জলটুকু আনিয়া তাঁহাকে দাও। এইভাবে দ্রব্য যজ্ঞ আরম্ভ কর। দ্রব্য যজ্ঞ হইতেই ধীরে ধীরে জ্ঞান যজ্ঞের অধিকারী হইবে। অন্তরের অন্তর-নিধিকে পাইবে। কর্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে। পরম শান্তিধামের সন্ধান পাইবে। ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা—১৩৬৮।

গ্রহ ভীতি

অনেকেই আমার মতামত জানিতে চাহিয়াছেন—এই যে অষ্টগ্রহের সংযোগ হইবে তাহার ফলাফল সম্বন্ধে। এতদিন আমি নীরবই ছিলাম। বহুলোক পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন ও চিঠি লিখিতেছেন। এত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং এত চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নহে। তাই এ বিষয়ে আমার মতামত জানাইতেছি—

আমি জ্যোতিষ নহি, ইহা সকলেই জানেন। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রে আমি আংশিকভাবে বিশ্বাস করি। গ্রহ আছে এবং গ্রহের কোপে মানুষের অনিষ্ট হয় ইহাও বিশ্বাস করি।

আমার নিজের জীবনেও গ্রহের প্রভাব অনেক সময় অনুভব করিয়াছি। অন্নময় কোষ হইতে মনোময় কোষ পর্য্যন্ত গ্রহের প্রভাব থাকে। মনের ঊর্দ্ধে বিজ্ঞানময় ক্ষেত্র হইতে ঊর্দ্ধতর লোকে গ্রহের কোন প্রভাব নাই। তাই ঈশ্বরযুক্ত তপস্বীদের উপর গ্রহের কোন অধিকার নাই যতক্ষণ তাঁহারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। যোগযুক্ত ব্যক্তিও যখন নিম্নস্তরে অবতরণ করিয়া সাধারণ অবস্থায় অবস্থান করেন তখন তাঁহার উপরও গ্রহ প্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াসী হয় এবং কখনও কখনও প্রভাব বিস্তার করিয়া কৃতকার্য্যও হয়।

সাধারণ মানুষ অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষেই অবস্থান করে। তাই তাহাদের উপর গ্রহের প্রভাব আছেই। এক এক সময় শনি, কেতু, রাহু প্রভৃতি এক একটি গ্রহের কোপে মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। পুরাণেও এইরূপ কাহিনী বহু আছে। এখন আটটি গ্রহ মিলিত হইতেছে। তাই সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ ভোগী বৈশ্যগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছে। মৃত্যুভয় বৈশ্য ও শূদ্রদেরই বেশী। ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় প্রাণকে আহুতি দিতে পারে। ব্রাহ্মণ দধীচির ন্যায় দেহত্যাগ করিতে পারে। তাই অষ্টগ্রহের সংযোগের ভয়ে বৈশ্যগণই অথবা বৈশ্যস্তরীয় মানুষগণই অধিকতর ভীত হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে—(১) প্রথমতঃ আটটি গ্রহের সত্যই মিলন ঘটিবে কি না?

(২) মিলন ঘটিলে সত্যই তাহারা জগতের অনিষ্ট করিবে কি না?

উত্তরে জানাইতেছি—(১) এখন অষ্টগ্রহের মিলন সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।

(২) মিলিত হইলেও তাহারা সকলেই জগতের অনিষ্ট করিবে না। কারণ গ্রহ বলিতে তাহারা সকলেই অনিষ্টকারী ইহা বুঝায় না। জগতের মঙ্গল বিধায়ক গ্রহও বহু আছে। অনিষ্টকারী গ্রহেরা যেমন অনিষ্ট করিবে তেমনই মঙ্গলকারী গ্রহগণ মঙ্গল করিবে। অতএব আপনারা যতটা ভীত হইয়াছেন ততটা ভীত হওয়ার কোন কারণ নাই। ইহা আপনাদের বিকল্প জ্ঞান মাত্র।

শ্রেষ্ঠ কথা হইল—আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, গ্রহের রাজ্যে নহে। গ্রহগণ ঈশ্বরের বিভূতি বা অংশমাত্র অথবা ইহাদিগকে ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ অনুচর বলা চলে। ঈশ্বর তাঁহার জগৎকে এখনই নষ্ট করিবেন না, কারণ প্রলয়ের বহু বিলম্ব আছে। কলির ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর আয়ু। ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ অধিক ৫ হাজার বৎসর কলির বয়স হইয়াছে। অতএব ইহা একটি মহাযুগেরই শেষ সময় নহে, মন্বন্তর ত' নহেই। মন্বন্তরে খণ্ড প্রলয় হইয়া থাকে এবং কল্পান্তে মহাপ্রলয় হইয়া থাকে।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন—এই যে গ্রহ শান্তির জন্য যাগ যজ্ঞ হইতেছে ইহার প্রয়োজন আছে কিনা? যজ্ঞের প্রয়োজন সকল সময়েই আছে। কারণ—"যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ।" যজ্ঞের দ্বারা যে মেঘ উৎপন্ন হয় তাহা বৃহী শষ্যাদির উপর বারি রূপে বর্ষিত হইয়া উত্তম অন্ন সৃষ্টি করে। সেই অন্নদ্বারা প্রতিপালিত জীব উত্তম দেহ ও মন লাভ করে। ইহাতে জগতের ও সমাজের ভবিষ্যৎ কল্যাণ হয়। অধিকন্তু সাধারণ মানুষের আস্তিক্য ও ধর্ম প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৫

দ্বিতীয় কথা হইল সাধারণতঃ মানুষ ভগবানের নাম করে না। বিপদের আতঙ্কে তবু ভগবানের নাম করিতেছে এবং কিছু দান করিতেছে। ধনীর অন্ন ও অর্থ দরিদ্রের হাতে যাইতেছে, দরিদ্র প্রতিপালন হইতেছে।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছে সত্যই কোপিত গ্রহের শান্তি এরূপ যজ্ঞাদির দ্বারা হয় কিনা? উত্তরে বলিতেছি—যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ শান্তির জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে পারেন তবে ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন না হইলেও কিছু পরিবর্ত্তন হইবেই। ঈশ্বর কৃপামর। আর্ত্ত জীব ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে তিনি সর্ব্বদাই রক্ষা করেন, এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত দান করেন। কথা হইল সত্য সত্যই সেরূপ ব্রাহ্মণ শুধু দক্ষিণার লোভে বৈশ্য ও শূদ্রের অধীন হইয়া যজ্ঞাদিতে ব্রতী হন কিনা? ব্রতী হইলেই প্রার্থনা করিতে পারিবেন, অন্য ভাবে পারিবেন না ইহা আপনাদের ভুল ধারণা। ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বিগণ উপনিষদের যুগ হইতেই বিশ্বের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং এখনও করিতেছেন লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া। ভারতের তথা বিশ্বের যথার্থ কল্যাণ ঐ গুপ্ত তপস্বীদের দ্বারাই হইয়া থাকে। তাঁহারা আত্মাকে অরণী করিয়া, প্রণবকে উত্তরারণী করিয়া যে জ্ঞানবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন এবং সেই বহ্নিতে বিশ্বের কল্যাণের জন্য যে আহুতি প্রদান করেন তাহাতেই জগতের যথার্থ কল্যাণ হয়। তাহা তামসিক ও রাজসিক যজ্ঞ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তবু এইরূপ রাজসিক ও তামসিক যজ্ঞের দ্বারাও সাধারণ মানুষের ও জগতের কিছু কল্যাণ হয় সন্দেহ নাই।

আপনারা ভীত না হইয়া যেভাবেই হউক ঈশ্বর পরায়ণ হউন। তাহাতেই সকল বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। বৈশ্য-

গণও বৈশ্যবুদ্ধি ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া দান করিলে কল্যাণ লাভ করিবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা—১৩৬৮।

আশ্রম সন্তানদের প্রতি

১। জানিতে পারিলাম তোমরা এ বৎসর কেহ কেহ পূজার চিঠি পাও নাই বলিয়া দুঃখীত হইয়াছ। চিঠি না পাওয়ার প্রধান তিনটি কারণ এ বৎসর ঘটিয়াছে।

(ক) দিব্যদর্শনে চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। তোমরা অনেকেই দিব্যদর্শনের গ্রাহক—তাই তাহাতে পূজার আমন্ত্রণ সহ সকল সংবাদই পাইয়াছ। অতএব স্বতন্ত্রভাবে চিঠি না পাইলেও তোমরা চিঠি পাও নাই ইহা ভাবা সঙ্গত নহে।

(খ) এবৎসর পূজার কয়েকদিন পূর্ব্বে বিহারে যে বন্যা হয় তাহাতে রেল লাইন পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়, ডাক ও তার বিভাগের কাজও উক্ত কারণে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে নাই। তজ্জন্য কোন কোন চিঠি নষ্ট হইয়াছে, কোন কোন চিঠি যথা সময়ে পাও নাই।

(গ) পূজার পূর্ব্বে অর্থাৎ জন্মাষ্টমী হইতে এখানে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক যাহারা থাকে তাহারা তপস্যা ও পূজার কাজ কর্ম্ম নিয়া এত ব্যস্ত থাকে যে তাহারা যথা সময়ে

দ্বিতীয় কথা হইল সাধারণতঃ মানুষ ভগবানের নাম করে না। বিপদের আতঙ্কে তবু ভগবানের নাম করিতেছে এবং কিছু দান করিতেছে। ধনীর অন্ন ও অর্থ দরিদ্রের হাতে যাইতেছে, দরিদ্র প্রতিপালন হইতেছে।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছে সত্যই কোপিত গ্রহের শান্তি এরূপ যজ্ঞাদির দ্বারা হয় কিনা? উত্তরে বলিতেছি—যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ শান্তির জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে পারেন তবে ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন না হইলেও কিছু পরিবর্ত্তন হইবেই। ঈশ্বর কৃপাময়। আর্ত্ত জীব ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে তিনি সর্ব্বদাই রক্ষা করেন, এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত দান করেন। কথা হইল সত্য সত্যই সেরূপ ব্রাহ্মণ শুধু দক্ষিণার লোভে বৈশ্য ও শূদ্রের অধীন হইয়া যজ্ঞাদিতে ব্রতী হন কিনা? ব্রতী হইলেই প্রার্থনা করিতে পারিবেন, অন্য ভাবে পারিবেন না ইহা আপনাদের ভুল ধারণা। ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বিগণ উপনিষদের যুগ হইতেই বিশ্বের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং এখনও করিতেছেন লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া। ভারতের তথা বিশ্বের যথার্থ কল্যাণ ঐ গুপ্ত তপস্বীদের দ্বারাই হইয়া থাকে। তাঁহারা আত্মাকে অরণী করিয়া, প্রণবকে উত্তরারণী করিয়া যে জ্ঞানবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন এবং সেই বহ্নিতে বিশ্বের কল্যাণের জন্য যে আহুতি প্রদান করেন তাহাতেই জগতের যথার্থ কল্যাণ হয়। তাহা তামসিক ও রাজসিক যজ্ঞ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তবু এইরূপ রাজসিক ও তামসিক যজ্ঞের দ্বারাও সাধারণ মানুষের ও জগতের কিছু কল্যাণ হয় সন্দেহ নাই।

আপনারা ভীত না হইয়া যেভাবেই হউক ঈশ্বর পরায়ণ হউন। তাহাতেই সকল বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। বৈশ্য-

গণও বৈশ্যবুদ্ধি ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া দান করিলে কল্যাণ লাভ করিবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা—১৩৬৮।

আশ্রম সন্তানদের প্রতি

১। জানিতে পারিলাম তোমরা এ বৎসর কেহ কেহ পূজার চিঠি পাও নাই বলিয়া দুঃখীত হইয়াছ। চিঠি না পাওয়ার প্রধান তিনটি কারণ এ বৎসর ঘটিয়াছে।

(ক) দিব্যদর্শনে চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। তোমরা অনেকেই দিব্যদর্শনের গ্রাহক—তাই তাহাতে পূজার আমন্ত্রণ সহ সকল সংবাদই পাইয়াছ। অতএব স্বতন্ত্রভাবে চিঠি না পাইলেও তোমরা চিঠি পাও নাই ইহা ভাবা সঙ্গত নহে।

(খ) এবৎসর পূজার কয়েকদিন পূর্ব্বে বিহারে যে বন্যা হয় তাহাতে রেল লাইন পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়, ডাক ও তার বিভাগের কাজও উক্ত কারণে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে নাই। তজ্জন্য কোন কোন চিঠি নষ্ট হইয়াছে, কোন কোন চিঠি যথা সময়ে পাও নাই।

(গ) পূজার পূর্ব্বে অর্থাৎ জন্মাষ্টমী হইতে এখানে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক যাহারা থাকে তাহারা তপস্যা ও পূজার কাজ কর্ম্ম নিয়া এত ব্যস্ত থাকে যে তাহারা যথা সময়ে

কোন কোন দিন আহারাদিও করিতে পারে না। পূজকদের ও অতিথিদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আশ্রম সন্তানগণকেই গ্রহণ করিতে হয়। অতএব তাহাদের এই কর্ম্ম বহুল জীবনে যদি কাহারও নামে চিঠি পাঠাইতে ভুল হয় তজ্জন্য তোমাদের দুঃখীত হওয়া উচিৎ নহে। আর এক কথা তোমাদিগকে জানাইতেছি যে প্রত্যেক চিঠিতেই তোমাদের ঠিকানা লিখিয়া দিবে এবং সত্বর উত্তর প্রত্যাশা করিলে রিপ্লাই কার্ড অথবা ষ্ট্যাম্প পাঠাইবে।

দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের সকল পূজা অনুষ্ঠানাদির জন্যই প্রত্যেক সন্তান চিরদিনের জন্য আমন্ত্রিত হয়। আশ্রম তোমাদের, পূজাও তোমাদেরই, অতএব চিঠির প্রত্যাশা না করিয়া তোমরা নিজেরাই নিজের পূজা ভাবিয়া যথা সময় পূজায় উপস্থিত হইবে। এবার পুনরায় তোমাদিগকে এই আমন্ত্রণ জানাইয়া রাখিতেছি। বিশেষভাবে জানাইয়া রাখিতেছি যে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা প্রতিবৎসরই দেওঘর আশ্রমে হইবে এবং শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা কোন্নগর আশ্রমে হইবে। ইহার পরিবর্ত্তন কোন সময়ই হইবে না। যদি হয় তাহা হইলে যথা সময়ে তাহা জানান হইবে। অন্যান্য পূজা যথা—গুরুপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শ্রীশ্রীব্রহ্মর্ষিদেবের আবির্ভাব তিথিপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দীপান্বিতার পূজা, রাসপূর্ণিমার পূজা, সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি ও দোলপূজা প্রভৃতি দেওঘর ও কোন্নগর আশ্রমে সংক্ষিপ্ত আকারে সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। তোমাদের যখন যেখানে সুবিধা তথায়ই উপস্থিত হইয়া পূজা করিতে পারিবে অথবা নিজ গৃহে বসিয়া সমবেতভাবে বা একা পূজা করিতে পারিবে।

১নং ঢাকেশ্বরী মিলে শ্রীমান সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে উল্লেখিত অধিকাংশ পূজাই সমবেতভাবে হইয়া থাকে। লক্ষ্ণৌতে শ্রীমান পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে এবং পাটনাতেও শ্রীমান সুধাময় রায়ের নেতৃত্বে উল্লেখিত পূজার অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব উক্ত স্থান সমূহের সন্নিকটে যাহারা থাকে তাহারা তথায় সমবেত হইয়া—পূজায় যোগদান করিতে পার। জলপাইগুড়িতে শ্রীমহেন্দ্র মোহন বাগচী ও শ্রীরমেশচন্দ্র ভৌমিকের নেতৃত্বে বহু পূজারই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ি ও তৎসন্নিহিত সন্তানগণ উক্ত পূজায় যোগদান করিবে। দূর দূরান্তর হইতে যে যেখানেই থাক দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীতুর্গা পূজায় আসিতে এবং কোন্নগর আশ্রমে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজার সময় উপস্থিত হইতে যত্নবান থাকিবে।

ইহাও জানাইয়া রাখিতেছি শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী হইতে দেওঘর আশ্রমে প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ ও মায়ের আবাহন ধ্যান প্রভৃতি হইয়া থাকে দীর্ঘ দেড় মাস কাল। ধর্মপ্রাণ পিপাসিত সন্তানগণ ইহাতে যোগদান করিলে সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

প্রায় প্রতি বৎসরই মাঘী পূর্ণিমা হইতে দোল পর্য্যন্ত মৌন থাকিয়া তপস্যা করিবার সুযোগও আশ্রম সন্তানগণকে দেওয়া হয়। দেওঘর আশ্রমে, ধ্যান জপ হোম প্রভৃতি যথা নিয়মে তখন হয়। স্বাধ্যায় প্রভৃতিরও সুযোগ থাকে, বিশেষতঃ বৈকালে তপস্যার লক্ষ্য কি, প্রাপ্য কি, পাওয়ার উপায় কি প্রভৃতি বিষয়ে দর্শন উপনিষৎ ও গীতার সাহায্যে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এই তপস্যায় যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করা সত্যই গৌরবের বিষয়। এ বৎসরও মাঘী

কোন কোন দিন আহারাদিও করিতে পারে না। পূজকদের ও অতিথিদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আশ্রম সন্তান-গণকেই গ্রহণ করিতে হয়। অতএব তাহাদের এই কর্ম্ম বহুল জীবনে যদি কাহারও নামে চিঠি পাঠাইতে ভুল হয় তজ্জন্য তোমাদের দুঃখীত হওয়া উচিং নহে। আর এক কথা তোমা-দিগকে জানাইতেছি যে প্রত্যেক চিঠিতেই তোমাদের ঠিকানা লিখিয়া দিবে এবং সত্বর উত্তর প্রত্যাশা করিলে রিপ্লাই কার্ড অথবা ষ্ট্যাম্প পাঠাইবে।

দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের সকল পূজা অনু-ষ্ঠানাদির জন্যই প্রত্যেক সন্তান চিরদিনের জন্য আমন্ত্রিত হয়। আশ্রম তোমাদের, পূজাও তোমাদেরই, অতএব চিঠির প্রত্যাশা না করিয়া তোমরা নিজেরাই নিজের পূজা ভাবিয়া যথা সময় পূজায় উপস্থিত হইবে। এবার পুনরায় তোমাদিগকে এই আমন্ত্রণ জানাইয়া রাখিতেছি। বিশেষভাবে জানাইয়া রাখিতেছি যে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা প্রতিবৎসরই দেওঘর আশ্রমে হইবে এবং শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা কোন্নগর আশ্রমে হইবে। ইহার পরিবর্ত্তন কোন সময়ই হইবে না। যদি হয় তাহা হইলে যথা সময়ে তাহা জানান হইবে। অন্যান্য পূজা যথা—গুরুপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শ্রীশ্রীব্রহ্মর্ষিদেবের আবির্ভাব তিথিপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দীপান্বিতার পূজা, রাসপূর্ণিমার পূজা, সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি ও দোলপূজা প্রভৃতি দেওঘর ও কোন্নগর আশ্রমে সংক্ষিপ্ত আকারে সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। তোমাদের যখন যেখানে সুবিধা তথায়ই উপস্থিত হইয়া পূজা করিতে পারিবে অথবা নিজ গৃহে বসিয়া সমবেতভাবে বা একা পূজা করিতে পারিবে।

১নং ঢাকেশ্বরী মিলে শ্রীমান সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে উল্লেখিত অধিকাংশ পূজাই সমবেতভাবে হইয়া থাকে। লক্ষ্ণৌতে শ্রীমান পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে এবং পাটনাতেও শ্রীমান সুধাময় রায়ের নেতৃত্বে উল্লেখিত পূজার অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব উক্ত স্থান সমূহের সন্নিকটে যাহারা থাকে তাহারা তথায় সমবেত হইয়া—পূজায় যোগদান করিতে পার। জলপাইগুড়িতে শ্রীমহেন্দ্র মোহন বাগচী ও শ্রীরমেশচন্দ্র ভৌমিকের নেতৃত্বে বহু পূজারই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ি ও তৎসন্নিহিত সন্তানগণ উক্ত পূজায় যোগদান করিবে। দূর দূরান্তর হইতে যে যেখানেই থাক দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজায় আসিতে এবং কোন্নগর আশ্রমে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজার সময় উপস্থিত হইতে যত্নবান থাকিবে।

ইহাও জানাইয়া রাখিতেছি শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী হইতে দেওঘর আশ্রমে প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ ও মায়ের আবাহন ধ্যান প্রভৃতি হইয়া থাকে দীর্ঘ দেড় মাস কাল। ধর্মপ্রাণ পিপাসিত সন্তানগণ ইহাতে যোগদান করিলে সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

প্রায় প্রতি বৎসরই মাঘী পূর্ণিমা হইতে দোল পর্য্যন্ত মৌন থাকিয়া তপস্যা করিবার সুযোগও আশ্রম সন্তানগণকে দেওয়া হয়। দেওঘর আশ্রমে, ধ্যান জপ হোম প্রভৃতি যথা নিয়মে তখন হয়। স্বাধ্যায় প্রভৃতিরও সুযোগ থাকে, বিশেষতঃ বৈকালে তপস্যার লক্ষ্য কি, প্রাপ্য কি, পাওয়ার উপায় কি প্রভৃতি বিষয়ে দর্শন উপনিষৎ ও গীতার সাহায্যে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এই তপস্যায় যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করা সত্যই গৌরবের বিষয়। এ বৎসরও মাঘী

পূর্ণিমা হইতে দোল পর্য্যন্ত একমাস এই তপস্যার সুযোগ দেওয়া হইবে। যাহারা একমাস যোগদান করিতে পারিবে না তাহারা পনের দিন বা সাত দিনও যোগদান করিতে পারিবে। যোগ-দান করিতে যাহারা ইচ্ছুক তাহারা পূর্ব্বে চিঠিপত্র লিখিয়া জানিবে ও অনুমতি গ্রহণ করিবে। তপস্যার নিয়ম—

সাধারণতঃ প্রত্যেকেই গৈরিক বসন পরিধান করে। দুই খানা কাপড় রং করিয়া লইলেই চলে। শীতকালে শীতবস্ত্র ব্যবহারে কোন আপত্তি নাই। প্রত্যেকেই মৌন থাকে এবং থাকা সঙ্গত। সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা থাকে। আহারের খরচ ব্রতীগণকে বহন করিতে হয়। যাহারা অক্ষম তাহাদের ব্যয়ভার আংশিক বা সমগ্রই আশ্রম বহন করিয়া থাকে। হোমের ঘি প্রত্যেকেই সঙ্গে নিয়া আসে। নিজ নিজ বিছানা মশারী ও পরিধেয় অন্যান্য কাপড়ও সঙ্গে নিয়া আসিবে। যাহারা কষ্ট করিতে অক্ষম তাহারা নিজ ব্যয়ে ভৃত্য বা সেবক সঙ্গে আনিতে পারে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা—১৩৬৮।

মূর্ত্তির মধ্যেও বিরাটের অবস্থিতি

তুমি দেহ নহ, দেহী। মৃত্যুর পরেও এই দেহী থাকে। এই দেহীই দেহকে অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অভিনয় করে। দেহী দেহ অপেক্ষা অনেক বড়, এবং সূক্ষ্ম। দেহী ইন্দ্রিয়, মন অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। তোমার দেহ হইতে ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিও ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম। দেহের পরিমান চার হাতের বেশী নহে। কিন্তু মনের পরিমাণ বহুদূর প্রসারিত। এক একটি ইন্দ্রিয়শক্তি দেহ অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। চক্ষুকে অবলম্বন করিয়া চক্ষুর ইন্দ্রিয়শক্তি বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায়। কর্ণকে অবলম্বন করিয়া শ্রবণশক্তি বহুদূর পর্য্যন্ত শুনিতে পায়। মন দূর দূরান্তর পর্য্যন্ত অবাধে ভ্রমণ করিতে পারে। এইরূপ মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ সমন্বিত তুমি। মনের তলদেশে যে বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহা আরও সূক্ষ্ম, আরও ব্যাপক। দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন বা ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব জীব, মনের তলদেশে কে আছে তাহা বুঝিতে পারে না। তাই দেহ মন ও ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া তাহার যে একটা নিজস্ব অবস্থিতি আছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই অজ্ঞ দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীবগণ স্থূলে যে জগৎকে দেখিতে পায়, যে জগৎকে ভোগ করিতে পারে তাহাকে বাস্তব জগৎ মনে করে। তাহার অতিরিক্ত কিছু আছে ইহা ভাবিতেই পারে না। দেহ ইন্দ্রিয় সর্ব্বস্ব লোকগণ যখন ঈশ্বরের আরাধনা করিতে যায় তখন তাঁহাকেও মূর্ত্তিমান বলিয়াই শুধু ভাবে। সে যেমন সাড়ে তিন হাত বা সাড়ে

চার হাত মানুষ, তাহার দেবতাও সেইরূপ একহাত, দেড়হাত পাঁচহাত বা সাতহাত দেববিগ্রহ মাত্র। বিগ্রহের পশ্চাতে যে দেবতার সূক্ষ্ম শক্তি রহিয়াছে এবং তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থিতি রহিয়াছে ইহা চিন্তা করিতেও পারে না। সে মূর্ত্তিকে সর্ব্বস্ব ভাবে। সে তাহার গোপালকে নাওয়ায়, খাওয়ায়, সে তাহার কালীকে ভোগ নৈবেদ্য দেয়, ঢাক বাজায়, সে তাহার শিবকে গাঁজা খাওয়ায়, কৃষ্ণকে মাখন খাওয়ায়। সে শিবের পাশে তাহার পার্থিব পিতা মাতার ন্যায় দেহধারী—পার্ব্বতীকে বসাইয়া 'মাতা মে পার্ব্বতী দেবী, পিতা দেব মহেশ্বর' বলিয়া বন্দনা করে। সে বিষ্ণুকে অনন্ত শয্যায় শায়িত করিয়া লক্ষ্মীকে পদসেবা করিতে বসায়। যেমন তাহার বাড়ীতে, প্রতিবেশীদের বাড়ীতে স্ত্রী পুরুষের অভিনয় দেখিতে পায়, তাহার দেবতাকেও সেইরূপ অভিনেতা রূপে কল্পনা করিয়া তৃপ্তি বোধ করে। দেহাত্মবান লোকের পক্ষে এইরূপ কল্পনা, ঈশ্বর নাই এইরূপ কল্পনার চেয়ে একটু ভাল সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়, যখন দেখিতে পাই তাহারা তাহাদের দেহের অতিরিক্ত যেমন কিছু ভাবিতে পারে না, সেইরূপ তাহাদের দেবতাকেও দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের অতিরিক্ত কিছু ভাবিতে পারে না এবং সেই অন্ধ কল্পনায় বিমূঢ়ের ন্যায় জীবন যাপন করে, তখনই আশ্চর্য্যান্বিত হই বেশী—"বিমূঢ়াঃ নানুপশ্যন্তি, পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।" এইরূপ বিমূঢ় ব্যক্তিদের বহু জন্ম কাটিয়া যায় ঐরূপ কাল্পনিক দেব দেবী নিয়া। দুঃখ ঘুচে না, অভিলাষ পূর্ণ হয় না। কখনও ক্রোধে ক্ষোভে ইষ্টের প্রতি রুষ্ট হয়—অভিলাষ পূর্ণ না হইলে। দেবতাকে ধিক্কারও দেয়। মনে মনে নাস্তিকের ন্যায় ঈশ্বর নাই বলিয়াও কল্পনা করে। কিন্তু

লাভের জন্য বহু গুরুর প্রয়োজন হয় না। সাধ্বী নারীর যেমন একই স্বামী থাকেন, সেইরূপ শুদ্ধ সাধকের—মুমুক্ষু সাধকের —একই ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু থাকেন। নৃত্য বা সঙ্গীত শিখিবার জন্য বিভিন্ন গুরুর প্রয়োজন হইতে পারে, অঙ্ক যিনি শিখাই-বেন তিনি হয়ত ভূগোল শিখাইতে পারেন না ; তাই ভূগোল শিখিবার জন্য অন্য গুরুর বা শিক্ষকের প্রয়োজন হইতে পারে। এ সকল পার্থিব বিদ্যা ; এই পার্থিব বিদ্যালাভর জন্য বিবিধ গুরুর প্রয়োজন হইয়াই থাকে। এই বিদ্যালাভের জন্য গুরুর সঙ্গে শিষ্যের আত্মবিনিময় কিছুই হয় না। অর্থের বিনিময়েই এই বিদ্যা লাভ করা যায়। গুরুর প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার প্রশ্ন এখানে থাকিলেও সেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার গভীরতা কমই থাকে। কিন্তু পরাবিদ্যা লাভের জন্য শিষ্যকে ছিন্ন সংশয় হইতে হয়, আত্ম নিবেদন করিতে হয়। গুরু ও গুরু বাক্যের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না আসিলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রদ্ধা ভিন্ন অন্তরের বিনিময় হয় না তাই গুরুগীতা বলিয়াছেন—

"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥"

গুরুর মূর্ত্তিকে ধ্যান করিবে, গুরুর বাক্যকে ভ্রম প্রমাদ বিহীন আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবে, গুরুর পদপ্রান্তে গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত করিবে। গুরুর সঙ্গে আত্ম বিনিময় না ঘটিলে শুধু লৌকিক শিষ্টাচারের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইবে না। ছিন্ন-সংশয় শিষ্য গুরুর পদপ্রান্তে নিজের অন্তরকে উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে আর আত্মজ্ঞ গুরু তাহার জন্ম জন্মন্তরীয় সমস্ত পাপকে অন্তর হইতে উৎপাটিত করিয়া তথায় রোপণ করিয়া দিবেন অমৃতের একটি বীজ।

"গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্ন-সংশয়াঃ"।

ছিন্ন-সংশয় শিষ্য অন্তর উন্মুক্ত করিয়া দিনে দিনে পলে পলে সঞ্চিত পাপ গুরুর পাদপদ্মে ঢালিয়া দিবে, আর মৌন গুরু শিষ্যের সমস্ত ক্লেদ নির্ব্বাকে তুলিয়া লইয়া অন্তরে সিঞ্চন করিবে অমৃতময় বারি। প্রতিদানের প্রত্যাশা তথায় থাকে না, পার্থিব বিনিময়ের প্রশ্নও তথায় নাই। একজন রিক্ত হইবে তাহার অনন্ত জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মরাশিকে ঢালিয়া দিয়া, আর একজন নির্ব্বাকে তাহার অন্তরস্থিত কর্ম্মবীজ সকলকে ভর্জ্জিত করিয়া তাহারই অলক্ষ্যে ঢালিয়া দিবে প্রাণে সুধার পাত্র। বহু মন্ত্র, বহু তন্ত্র, বহু বিধান তথায় নাই, আছে শুধু আত্ম বিনিময়ের প্রশ্ন, আছে শুধু শ্রদ্ধাবনত হওয়ার প্রশ্ন। তাই শাস্ত্র বলে, "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।" মুমুক্ষ শিষ্যের আর কোন সম্পদের প্রয়োজন নাই, শুধু এই একটি সম্পদের আশ্রয়েই সে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর অন্তর জয় করিতে পারে। শুধু শ্রদ্ধা, শুধু প্রেম, শুধু আত্মনিবেদন, শুধু অশ্রু বারি, শুধু কাতর আর্ত্ত-নাদ। অন্য কোন সম্পদের প্রয়োজন নাই, কোন বৈভবের প্রয়োজন নাই, গভীর বিদ্যা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও প্রয়োজন নাই; প্রয়োজন আছে শুধু শ্রদ্ধার—গভীর শ্রদ্ধার। সমস্ত পৃথিবীর সম্পদ যদি কেহ ঢালিয়া দেয় কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর পাদপদ্মে, তবে তাহার বিনিময়েও কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শ্রদ্ধা, রিক্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধা, কাঙ্গাল হৃদয়ের শ্রদ্ধা ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর অন্তরকে জয় করিতে পারে। তাই শাস্ত্র বলে, "শিষ্যাস্তু ছিন্ন-সংশয়াঃ, গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং"। কতগুলি যোগের কৌশল, কতগুলি মন্ত্র শিখাইয়া দিলেও আর্ত্ত শিষ্য তাহা বহন করিয়া পথে চলিতে পারে না। তাই ব্রহ্মনিষ্ঠ

গুরু তাহার প্রিয় শিষ্যকে শুধু একটি অক্ষর দেন, শুধু একটি কথা দেন। সেই একটি কথার মধ্যে, সেই একটি মন্ত্রের মধ্যে সমস্তই নিহিত থাকে। 'এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্ ……এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥' সেই একটি মাত্র মন্ত্রকে পাইয়া, সেই একটি মাত্র কথাকে পাইয়া শ্রদ্ধাবান শিষ্য এই মরণশীল জগৎ হইতে ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হন অথবা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই লাভ করেন।

উপনিষদের যুগে সমিধপাণি শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্ গুরু একটি মাত্র মন্ত্র দিয়া পাঠাইয়াছিলেন গোধন চরাইতে দূরে—অরণ্যে প্রান্তরে। শ্রদ্ধাবান শিষ্য ঐ একটি মাত্র কথাকে, ঐ একটি মাত্র মন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অরণ্যে চলিয়া গেলেন। নিষ্ঠাবান সেই শিষ্য, ভক্তিমান সেই শিষ্য যখন গুরুগৃহে আবার ফিরিয়া আসিলেন বহু দিনান্তে, তখন গুরু স্মিতহাস্যে তাহার সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তোমাকে ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া মনে হইতেছে।" শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর পাদমূলে প্রণত হইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বিনীত কণ্ঠে বলিলেন, "গুরু কৃপাহি কেবলম্; গুরু কৃপাহি কেবলম্।" অরণ্যে অরণ্যে, প্রান্তরে প্রান্তরে তুমি সাথী ছিলে মম; ভুলি নাই আমি, ভুল নাই তুমি। অন্তরের ছিল গভীর সংযোগ তোমার ও আমার মাঝে, ঐ মন্ত্রের স্রোতনায়। ঐ অন্তরের সূক্ষ্ম তারে তারে, আমার হৃদয় তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তুমি তানপুরা বাজাইয়াছ তোমার ধ্যান কক্ষ হইতে, আর আমি নিবিষ্ট মনে শুনিয়াছি সেই নিস্পন্দিত ধ্বনি—ঐ অরণ্যে, প্রান্তরে। আকর্ষণ করিয়াছ তুমি, মন্থন করিয়াছ তুমি, লুণ্ঠন করিয়াছ তুমি। জন্ম জন্মান্তরীয় পাপ গ্রহণ করিয়াছ লুণ্ঠন করিয়া। নূতন ছাঁচে ঢালিবার জন্য মন্থন করিয়াছ আমার

হৃদয়স্থিত কর্দ্দম রাশিকে, বাজাইয়াছ কত ঘাত প্রতিঘাতে আমার হৃদয়ের তন্ত্রী সকলকে, সুর দিয়াছ তুমি আমার বেসুরা জীবনে, নিয়ন্ত্রিত করিয়াছ তুমি আমার উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে। ডাকিয়াছ—ডাকিয়াছ হৃদয় গুহায় বসিয়া—হে আত্মজ্ঞ ঋষি—তুমি অমোঘ ডাকে আমায় ডাকিয়াছ। তাইতো তোমারই কৃপায় আমার অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়াছে তোমারই প্রদত্ত ঐ আত্মজ্ঞান।

তাই আত্মজ্ঞ গুরু এখনও ডাকিয়া বলেন—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শোন। কণ্টক বনে বিচরণ করিয়া শত কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া এখনও কি লালসা মিটে নাই? যাহার মিটিয়াছে, যে আর্ত্ত হইয়াছ, সে শোন! যে লাভ করিতে চাহিয়াছ কাষ্ঠাগতি, পরাগতি—সেই আর্ত্ত সাধক শোন! এই পুণ্য তিথিতে আবার উৎকর্ণ হইয়া শোন—কিরূপে দ্বন্দ্বাতীত হইবে, কিরূপে সত্ত্বস্থ হইবে, কিরূপে গুণাতীত হইবে, কিরূপে সকল জ্বালা জুড়াইবে, সেই কথা শোন। অর্থের কথা নহে, বাণিজ্যের কথা নহে, আরও গৃধ্ন হইয়া শকুনির ন্যায় কিরূপে সংসারে নিমগ্ন হইবে, সে কথা শুনিতে আজ আস নাই, আসিয়াছ কিরূপে কাষ্ঠাগতি লাভ করিবে, কিরূপে পরাগতি লাভ করিবে, কিরূপে তাপ-দগ্ধ হৃদয়ে, পাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি পাইবে, সে কথা শুনিতে। জানিতে আসিয়াছ—মন ও বুদ্ধির পরপারে ঐ দহর আকাশে কিরূপে প্রবেশ করিয়া শান্তিলাভ করিবে, সেই পথের সন্ধান। ভূতাকাশ হইতে চিত্তাকাশে, চিত্তাকাশ হইতে চিদাকাশে—দহর আকাশে—সেই শান্তিরাজ্যে কিরূপে প্রবেশ করিবে তাহাই জানিতে আসিয়াছ।

প্রকাশ্যে বলিতে সাহসী হয় না।

তুমি যখন দেহ নহ, দেহী ; দেহটি তোমার একটি ভোগ আয়তন মাত্র। তুমি সূক্ষ্ম, বিরাট। কর্ম্মাশয়কে অবলম্বন করিয়া, বিবিধ সংস্কারকে অবলম্বন করিয়া তোমার বার বার এই সংসারে আবর্ত্তন বিবর্ত্তন হইতেছে। এইরূপ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক যে তুমি, তোমাকে পৃথিবীর কোন ধন জন মান খুশী করিতে পারিতেছি না। অট্টালিকায় শুইয়াও তোমার তৃপ্তি নাই। নিত্য চর্ব্ব চোষ্য ভোজন করিয়াও তোমার পরিতোষ নাই। কাঙ্গাল যাহা লাভ করিবার জন্য লালায়িত, ভোগী ধনী তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ব্যস্ত। তাই বুদ্ধ রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বাহির হন। এইরূপ সূক্ষ্ম রিরাট যে তুমি, সেই তোমার কিরূপে পূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ হইতে পারে— এক হাত, দেড় হাত বা সাত হাত বিগ্রহকে লইয়া ? তুমি যখন বিরাট, তোমার আরাধ্য দেবতা তাহা অপেক্ষাও বিরাট হইবেন সন্দেহ নাই। তুমি যখন সূক্ষ্ম, তোমার দেবতাও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইবেন। তাই গীতাকার বলেন—সূক্ষ্মত্বাৎ তদ্ অবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।' তাই উপনিষদ্ বলেন— "তদ্দূরে, তৎ অন্তিকে, তৎ অন্তরস্য সর্ব্বস্য, তৎ সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।" তাই ঋষিগণ বলেন—'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্'।

রূপ তাঁহার নাই তাহা নহে। রূপবান হইয়া মূর্ত্তিমান হইয়া তিনি আসিতেও পারেন না, ইহাও নহে। এই মূর্ত্তিমান বিশ্বরূপে তিনিই ত' রূপায়িত রহিয়াছেন—অহং আদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানাং অন্ত এবচ। 'রসোঽহং অপ্সু কৌন্তেয়, প্রভাস্মি

৬

শশী সূর্য্যয়োঃ' এ তাঁহারই উক্তি। 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি ত্বয়া সর্ব্বং ইদং ততম্'—এও ত' তাঁহারই উক্তি। জন্মাদ্যস্য যতঃ—এও ত' দ্রষ্টা ঋষিরই উক্তি। বিশ্বরূপে বিশ্বপতিকে দেখিতে পাও না, অনন্তরূপে অনন্তপতিকে দেখিতে পাও না, তাই দেড় হাত, পাঁচ হাত, সাত হাত ঠাকুর তৈয়ার কর। ইহাতে ঠাকুরটি দেড় হাত, পাঁচ হাত বা সাত হাত হইয়া গেল না। ঐ মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া তুমি চিত্তকে প্রথম কেন্দ্রস্থ করিতে পারিলে অনন্ত রূপের মধ্যে সেই ভূমাকে দেখিবার অধিকার অর্জ্জন করিবে। ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি। প্রতিভূতে তাঁহাকে দেখিতে পাও না, তাই বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে প্রথম চিত্তকে কেন্দ্রস্থ করিবার জন্য ঋষিগণ প্রথম মূর্ত্তি পূজার কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শুধু রূপেতেই চিত্ত কেন্দ্রস্থ হয় না। কারণ চিত্তও যে সূক্ষ্ম জিনিষ। তাই স্থূল রূপে তাহাকে নিরোধ করা যায় না। বার বার ছুটিয়া আসে, অলক্ষ্যে কোথায় ছুটিয়া যায়। ঐ মূর্ত্তির সঙ্গে যদি মূর্ত্তির রহস্যবোধ ফুটাইতে পার, ঐ জড় মূর্ত্তির তলদেশে যদি চিন্ময়কে দেখাইতে পার, তবেই চিত্ত মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া কিছুটা শান্ত হইবে। রূপের সাথে রূপের ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মের সাথে ধর্ম্মীকে যদি চিন্তা করিতে পার, তবেই চিত্ত শান্ত হইবে। শুধু রূপে কখনও চিত্ত শান্ত হয় না। শান্ত হয় একথা যাহারা বলে তাহারা কখনও তপস্যা করে নাই, বিভ্রান্ত অজ্ঞ তাহারা। ইন্দ্রিয় ও দেহ পরায়ণ তাহারা। তোমরা ঐরূপ ফেনান কথায় ভুলিবে না। রূপের সঙ্গে গুণের চিন্তা কর, গুণের তলদেশে গুণীকে ভাব, তবেই পাইবে গুণাতীত ভাবাতীত সেই আনন্দময়কে।

আনন্দ লাভই ত' তোমার জীবনের লক্ষ্য। যাহা কিছু করিতেছ, ভোগ বা ত্যাগ, তাহা আনন্দেরই জন্য। আবর্জ্জনা মাখান, অশুদ্ধ চিত্তে সে আনন্দময়কে কখনও পাওয়া যায় না। আবর্জ্জনাকে ত্যাগ কর। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এ সকল হইল চিত্তের আবর্জ্জনা। প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম এ সকল প্রমাণ বৃত্তি হইল চিত্তের আবর্জ্জনা। পূর্ব্ব-বং শেষবং সামান্যতঃ প্রভৃতি অনুমান হইল চিত্তের আবর্জ্জনা। এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে দেখা, অথচ সেই দেখা সত্য নহে, ইহা হইল চিত্তের আবর্জ্জনা। স্বপ্ন, নিদ্রা স্মৃতি হইল চিত্তের আবর্জ্জনা। জঞ্জালগুলি বস্তু নহে, আবর্জ্জনাগুলিই চিত্ত নহে। জঞ্জাল ফেলিয়া দাও, যথার্থ বস্তুকে পাইবে। আবর্জ্জনা ফেলিয়া দাও—যথার্থ চিত্তকে পাইবে। চিত্তকে পাইলেই সৎ চিৎ আনন্দকে পাইবে। এই সৎ চিৎ আনন্দকে পাওয়াই মানব জীবনের লক্ষ্য, ইহাই জীবনের পরাগতি, ইহাই জীবনের পরা-কাষ্ঠা অবস্থা।

তাই বলি মূর্ত্তির উপাসনা কর, কিন্তু মূর্ত্তিকে সর্ব্বস্ব ভাবিও না। তাই বলি গুণের উপাসনা কর, কিন্তু তাহাকেই সর্ব্বস্ব ভাবিও না। তাই বলি স্বপ্নে কোন দেব দেবী দেখিয়া তুষ্ট হইও না। তাই বলি কোন বিভূতি লাভ করিয়া খুশী হইও না। যদি সত্যই আনন্দ চাও, যদি সত্যই বাধা বিমুক্ত হইতে চাও, যদি সত্যই জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ হইতে নিজেকে বাঁচাইতে চাও, তবে ধীর ভাবে নিজেকে বিশ্লেষণ কর। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে যে মন, বুদ্ধি রহিয়াছে তাহার নিকট পৌঁছিতে চেষ্টা কর। সেই বিশুদ্ধ মন ও বুদ্ধিকে নিয়া অর্থাৎ মন বুদ্ধি ও চিত্তকে নিয়া নিজের অহংকে আবিষ্কার কর। এই আমিকে

পাইলে, এই অহংকে পাইলে, এই অস্মিতাকে পাইলে অস্মিরও যিনি অস্মি, এই অহং-এরও যিনি পরম অহং সেই প্রেমময়কে, সেই চির সুন্দরকে, সেই চির নবীনকে দেখিতে পাইবে, লাভ করিবে। মূর্ত্তিকে ঘৃণা করিও না, মন্দিরকে নাট্যশালা মনে করিও না। এই মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়াই যথার্থ মূর্ত্তির—নির্ব্বিকার, বিরাট, চৈতন্যঘন মূর্ত্তির সন্ধান পাইবে। 'ন তৎ ভাসয়তে সূর্য্যঃ ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ'। অথচ তিনি আছেন। তিনি আছেন, সেই চির সুন্দর আছেন। আর তুমিও আছ। তাঁহার প্রেমময় বক্ষে তুমিও আছ। নিত্য তাঁহার প্রেমালিঙ্গনে সংবদ্ধ আনন্দঘন শিশু তুমিও আছ। এই নিত্য চিন্ময় ধামে, শুধু তিনি ও তুমি, অথবা শুধু তিনি, অথবা শুধু তুমি। অভেদেতে ভেদ, ক্ষণে অভেদ, ক্ষণে ভেদ। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব অবশিষ্যতে। ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা—১৩৬৮।

শিষ্যের প্রতি গুরুর এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য

বহুজন্ম ঘুরিয়া আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, শান্তি লাভের জন্য, তৃষিত অন্তর একদিন যাঁহাকে আত্মনিবেদন করে তিনিই পরম ও চরম গুরু। আত্মজ্ঞান লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য। অপরা-বিদ্যা লাভের জন্য গুরু বহু হইতে পারে কিন্তু পরা-বিদ্যা

"ন কর্ম্মনা ন প্রজয়া ন ধনেন—"

বহু কর্ম্মের দ্বারা নহে, বহু পুত্রের দ্বারা নহে, বহু ধনের দ্বারা নহে। "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানসুঃ"। শুধু ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃতত্বকে লাভ করিতে পারিবে।

সংসার পরিজনকে ত্যাগ করিলেই ত্যাগ হয় না, শুধু ক্ষুদ্র ঐটুকু ত্যাগের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। ত্যাগ বলিতে ঋষিগণ ঐ অহঙ্কারকে ত্যাগ করিতেই বলিয়াছেন। যে অহংকে আশ্রয় করিয়া তুমি কামে, ক্রোধে, লোভে, হিংসায়, দ্বেষে প্রমত্ত হইতেছ, যে 'অহং'-এর বশে থাকিয়া তুমি রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, জন্ম মৃত্যুর তাপ সহিতেছ, যে 'অহং'কে আশ্রয় করিয়া তুমি ধনী, মানী, বিদ্বান, প্রেমিক অথবা সাধক বলিয়া গর্ব্ববোধ করিতেছ, সেই 'অহং'কে সেই 'আমি'কে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সেই আমির নিরঞ্জন না হইলে, আত্মজ্ঞ গুরুকে বরণ করিতে পারিবে না। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল'—সেই 'অহং'কে নিয়া—যদি তুমি শ্রদ্ধাবানও হও,—তবে তোমার গর্ব্বিত কণ্ঠ বার বার বলিবে—'আমি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাবান, আমি শ্রেষ্ঠ তপস্বী।' ভগবানের সিংহাসন সেই অহং অধিকার করিতে চাহিবে। তাই প্রথম এই 'অহং'কে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য শ্রদ্ধাকে বরণ করিতে হইবে। শ্রদ্ধার নির্ম্মল সলিলে 'অহং'কে নিমজ্জিত করিয়া, বিধৌত করিয়া তবে আত্মজ্ঞ গুরুর চরণপ্রান্তে উপনীত হইতে হইবে।

"স্নান করে আয় তোরা সবে
ত্যাগের বসন পরতে হবে

সন্ধ্যা বনের কুসুম তুলে
গাঁথতে হবে হার
ওরে সময় নেই রে আর।"

ঐ শ্রদ্ধার শীতল স্নিগ্ধ জলে অবগাহন করিতে হইবে, জীবনসন্ধ্যার উদ্যানে যে শীর্ণ ফুল রহিয়াছে, তাহারই মালা গাঁথিয়া অর্ঘ্য দিতে হইবে। অহং-বিবর্জ্জিত 'অহং'কে আত্মজ্ঞ গুরুর চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে। শ্রদ্ধা তোমার আশ্রয়, শ্রদ্ধাই তোমার বান্ধব, শ্রদ্ধাই তোমার পাথেয়। হে পথিক হে অনন্ত পথের যাত্রী, এই শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করিয়া তুমি মৌন গুরুর সমীপস্থ হও। তোমার নাম ও গোত্রের পরিচয় যদি নাও থাকে, তুমি সত্যকামের ন্যায় মায়ের গোত্রকে নিজের গোত্র বলিয়া পরিচয় দাও। বল, জানিনা কোথা হইতে আসিয়াছি, জানিনা এই যাত্রা সুরু হইয়াছে কবে, জানিনা কত গৃহে জন্ম ধারণ করিয়াছি। আমার অগণিত জন্ম, অগণিত জাতি ও কুল, তাই গোত্রের নাই পরিচয়, জন্মের নাই সীমা। আমি জানিয়াছি, আমি শুনিয়াছি সেই আহ্বান, সেই কম্বুকণ্ঠ যে ঘোষণা করিয়াছে—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। আমি অমৃত হইতে জাত, পথ হারাইয়াছিলাম, আজ দিব্য পথের সন্ধানে আসিয়াছি, সেই অমৃতত্বে পৌঁছিবার জন্য।

মুমুক্ষ সাধকের ইহাই ত' পরিচয়। মুমুক্ষ সাধক ছিন্ন-সংশয় হইয়া এই পরিচয় দেয়। 'আমি অমৃতের পুত্র'। তাই ওগো 'অমৃতময় পুরুষ, আমাকে ব্রহ্ম-মন্ত্রে, অমৃত-মন্ত্রে দীক্ষিত কর।

"ঘাটে ঘাটে ফিরবো না আর
ভাসিয়ে এই জীর্ণ তরী—"

আর ঘাটে ঘাটে ফিরব না। আজ এই পুণ্য তিথিতে আমি আবার নব-অনুরাগে অনুরঞ্জিত হইয়া গাহিব—হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে চলিতে জানি না। আর বার বার প্রণত হইয়া বলিব—

গুরোর্মধ্যে স্থিতং বিশ্বং বিশ্বমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুর্বিবশ্বং নমস্তেঽস্তু বিশ্বগুরুং নমাম্যহম্॥

আবার গাহিব—

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষিভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি
সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা—১৩৬৯।

বোধিবৃক্ষ মূলে

ভগবান বুদ্ধদেবের পুণ্য জীবনের কথা বাল্যকালেই বহুবার শুনিয়াছি। কৈশোরে বুদ্ধচরিত 'অমিতাভ' বার বার বহুবার পড়িয়াছি। নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছে। মন মুগ্ধ হইয়াছে, চিত্ত শান্ত হইয়াছে। কখনও জীবনের পবিত্র গাথা পড়িতে পড়িতে তাঁহার ত্যাগ তপস্যা ও সংযমের কথায় আলোকিত হইয়াছে অন্তরের অন্তস্তল। বুদ্ধ চৈতন্য ও যীশু আমার জীবন পথের আলোক বর্ত্তিকা। শ্রীচৈতন্যকে ভাবিতে ভাবিতে অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে শুদ্ধ ভাবের কত প্রস্রবণ। পুণ্যাত্মা

যীশুকে ভাবিয়া পাইয়াছি নির্য্যাতন সহিবার অসীম ধৈর্য্য ও সংযম। আর ভগবান বুদ্ধদেবকে ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাইয়াছি মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের তলদেশে অবস্থিত বিরাট গভীর চিন্ময় বোধস্বরূপের তলস্থ লক্ষণ সমূহ। রূপ হারাইয়াছে নামে, নাম দিয়াছে বিরাট চিন্ময় বোধের সন্ধান। গুণীর রূপকে আশ্রয় করিয়া পাইয়াছি তাঁহার গুণকে। ভাবুককে আশ্রয় করিয়া পাইয়াছি তাঁহার ভাবকে। সহিষ্ণুতাকে আশ্রয় করিয়া পাইয়াছি অসীম ধৈর্য্য। তাই আমি বুদ্ধের শুধু রূপের উপাসক নহি; আমি চিরদিনের উপাসক তাঁহার গুণের, তাঁহার বোধি সত্ত্বার। যে সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত শুধু বুদ্ধদেবের ঐ মূর্ত্তিই নহে, বরং প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধের ধর্ম্ম, বুদ্ধের সঙ্ঘ, বুদ্ধের বুদ্ধত্ব। নাম ও রূপ তথা মন ও অহঙ্কারের তলায় তলায় যে আত্ম-বোধ অবস্থিত রহিয়াছে, যাহাতে বিধৃত হইয়াছে অসংখ্য নাম ও রূপ অথচ নাম রূপের অতীত যিনি (ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো) তিনিই ত' বুদ্ধের উপাস্য ধন। তাঁহাকে পাইয়াই, সেই বিরাট চিন্ময় বোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গৌতম হইয়াছিলেন ভগবান বুদ্ধ।

বুদ্ধদেবের তপস্যা-ভূমি বুদ্ধগয়ায় যাইবার, তথা যে বোধিবৃক্ষ মূলে গৌতম বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই বৃক্ষমূলেও তাঁহাকে গভীর ভাবে পাইবার অভিলাষ ক্ষণে ক্ষণে জাগিত। গয়া ষ্টেশন হইয়া বহুবার পশ্চিম ভারতে গিয়াছি কিন্তু তথায় নামিবার সংযোগ ঘটে নাই। ষ্টেশন অতিক্রম করার সময় বার বার বিষ্ণু পাদপদ্মকে তথা ভগবান বুদ্ধকে বহুবার স্মরণ ও প্রণাম করিয়াছি। এবার (১৯৬১—২রা আগষ্ট) কোডার-মার ভক্ত শ্রীপুরণমল রাজগেরিয়ার বাড়ী হইতে গয়ায় যাওয়ার

সংযোগ ঘটিল। সঙ্গে চলিল্ল অনেকে। বিষ্ণুপাদপদ্ম পূজা করিয়া তথায় পিতৃপুরুষদের ও জানা অজানা মৃত সকলের আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়া প্রণতি জানাইলাম। দ্বিপ্রহরের পর আমাদের দু'খানা গাড়ী বুদ্ধগয়ার অভিমুখে যাত্রা করিল। বৈষ্ণব সাধকগণ গাহিয়া থাকেন—

"আজিও নীলাচলে নাচে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

বৃন্দাবনে রাসমঞ্চে, বংশীবটে, যমুনাতটে, নিধুবনে, নিকুঞ্জ-বনে কোন কোন ভাগ্যবান ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান। এই কথা বৈষ্ণব প্রেমিক সাধকগণ বলিয়া থাকেন। অতি-মানস চেতনায় নহে, শুধু সূক্ষ্ম জগতে নহে, দিব্যরূপে এই স্থূল জগতেও তাঁহাকে দেখিতে পান। এই চক্ষুই দিব্য চক্ষুতে রূপান্তরিত হইলে নীলাচলের মন্দিরে শুধু জগন্নাথকেই প্রেমিক-গণ দেখিতে পান না, দেখিতে পান ঐ ভাব উন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে। প্রেমিক যীশু শুধু খৃষ্টানদের গীর্জ্জাতেই বদ্ধ নহেন, তিনি আবির্ভূত হন ভাবুক ভক্তের হৃদয়ে হৃদয়ে। তপস্বিগণ রূপ হইতে যেমন গুণে এবং গুণ হইতে গুণাতীতে প্রবেশ করেন তেমনি ভাবের অভিব্যাঞ্জনায় দিব্য ভাবে উন্মত্ত হইলে তাহারা ভাবাতীত ক্ষেত্র হইতে ভাব-সমুদ্রে তাঁহাকে যেমন পান; তেমনি দিব্য নাম ও রূপে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে দেখিতে পান এই স্থূল জগতে। বোধিবৃক্ষ ও বুদ্ধগয়া প্রত্যেক সাধকের এক পুণ্যভূমি। অন্তরে ভাব লইয়া চক্ষুর মলিনতা দূর করিয়া যে তথায় যাইবে সে অদ্যাপিও অনুভব করিবে বুদ্ধের চিন্ময় সত্তাকে। বুদ্ধের দিব্য ভাবকে, বুদ্ধের নাম ও রূপকে।

আমাদের গাড়ী যথাস্থানে যাইয়া থামিল। কিছু মালা ও

ফুল সংগ্রহ করিয়া আমরা প্রথম মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এখন তথায় বহু মন্দির হইয়াছে ও হইতেছে। ব্যবসায়ী পাণ্ডাও তথায় জুটিয়াছে। তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যখন সেই শান্ত নিস্পন্দিত মন্দিরে যাইয়া ধ্যানমগ্ন ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তির কাছে দাঁড়াইলাম তখন সত্যই অনুভব হইতেছিল এই মর্ম্মর মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া ভগবান বুদ্ধদেব এখনও এখানে রহিয়াছেন। মর্ম্মর মূর্ত্তি যেন স্পন্দিত হইতেছিল। তাঁহার ভাবগম্ভীর মুখে মধুর হাসি। বহুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে অন্তরের ভাষায় ভাব বিনিময় হইল। পুস্পাঞ্জলি বেদীমূলে অর্পণ করিলাম। চরণপ্রান্তে প্রণত হইলাম। দলে দলে প্রতিদিনই আসে তথায় বহু দর্শক। তাহারা দেখা পায় কিনা জানি না বরং কাহারও কাহারও চঞ্চল গতিবিধিতে সেই মন্দির অশান্ত হইয়া উঠে। আমরা মন্দির হইতে চলিলাম সেই বোধিবৃক্ষমূলে। পথে নূতন অশ্বত্থ গাছের মূলে পাণ্ডাগণ লোককে প্রবঞ্চনা করিয়া পয়সা সংগ্রহ করিতেছে ঐ বৃক্ষকেই বোধিবৃক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়া। ভারতের তীর্থে তীর্থে এরূপ বহু প্রবঞ্চক আছে। জানিনা গভর্ণমেণ্ট কেন এইরূপ প্রবঞ্চকদিগকে প্রশ্রয় দেন। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ইহাদের আচরণে চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। নীরবে আমরা চলিলাম ঐ বোধিবৃক্ষমূলে। দেখিলাম একজন অভারতীয় তথায় বসিয়া বৌদ্ধগ্রন্থ পড়িতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে আনমনাও হইতেছেন। মুখে তাঁহার দীপ্তি, চোখে তাঁহার অশ্রুকণা। মুণ্ডিত মস্তক—ভিক্ষুকের বেশ। চেহারায় মনে হইল হয়ত বা জাপানের লোক। এত দেখিবার ও ভাবিবার অবকাশও ছিল না। আমরা যাইয়া ঐ বোধিবৃক্ষের ছায়াতলে বসিলাম। প্রাচীন বেদীর পাদদেশে। অশান্ত মন

শান্ত হয় ঐ বেদীমূলে বসিলে। ক্ষুব্ধ চিত্ত প্রশান্ত হয় ঐ বেদীমূলে উপবেশন করিলে। আড়াই হাজার বৎসরের সেই তপস্যার বহ্নি এখনও প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। অনির্ব্বাণ রহিয়াছে চিন্ময়বোধশিখা। একটু শান্ত হইয়া বসিতেই চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া লয় ঐ দিব্য চেতনা। অজগর সাপ যেমন তাহার শ্বাসের আকর্ষণে দূরস্থিত খাদ্যবস্তুকে আকর্ষণ করিয়া লয়; সেইরূপ মন ও ইন্দ্রিয়ের জগৎ হইতে জীববোধকে আকর্ষণ করিয়া লয় বুদ্ধের বোধিসত্তায়। তাঁহার তপস্যা প্রভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল যে অগ্নিশিখা একদিন, সেই শিখা ম্লান হয় নাই। অন্তরকে ধীরে ধীরে আলোকিত করে, জীবচেতনাকে ধীরে ধীরে উজ্জ্বলতর করে। শান্ত করে, সমাহিত করে, নিস্প-ন্দিত করে। আবার জীববোধ যখন সেই নিস্পন্দিত দিব্য রাজ্য হইতে জাগিয়া উঠে তখন স্বতঃই অনুভব করে তাঁহাকে শুদ্ধ ও নিষ্পাপ বলিয়া। সেই বোধিসত্তার এমনই আকর্ষণ, শুধু বাহির হইতে অন্তরে গভীরে নিমজ্জিত করিয়া লইতে চাহে।

যাহাদের চিত্ত সহজে শান্ত হয় না তাহাদিগকে একটু শুদ্ধ দেহ ও মন নিয়া তথায় যাইতে অনুরোধ জানাইতেছি। বৈষ-য়িক লালসা নিয়া তথায় যাইলে কোন লাভ হইবে না। কাম ও ক্রোধে পরিপূর্ণ দেহ ও মন নিয়া তথায় যাইয়া কোন সাড়া পাইবে না। আগে দেহ ও মনকে শুদ্ধ কর। সেই শুদ্ধ দেহ ও মন নিয়া যাইয়া বেদীমূলে উপবেশন কর। আমার বুদ্ধদেবকে তথায় পাইবে। আমার বুদ্ধদেবের ধর্ম্মকেও তথায় পাইবে। পাইবে তাঁহাকে অন্তরে, পাইবে তাঁহাকে দিব্যলোকে, পাইবে তাঁহাকে স্থূলে দিব্য-দৃষ্টির প্রভাবে।

বোধিবৃক্ষ তোমাকে প্রণাম করি। পবিত্রভূমি তোমাকে

প্রণাম করি। হয়ত সেই আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন বৃক্ষ তথায় নাই, কিন্তু সেই ভূমিতে ঐ বৃক্ষের মূল ও শাখা হইতে যে বৃক্ষের উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মহিমাও সেই পুরাতন বোধিবৃক্ষের ন্যায়ই—এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই পবিত্র গ্রাম্য ভূমিকে আধুনিক সভ্যতার ছাঁচে ঢালিবার জন্য পাথরের বেদী নির্ম্মিত হইলেও সেই ভূমির পবিত্রতা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। কলুষিত চিত্ত লইয়া তথায় যাইও না, বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা লইয়া তথায় যাইও না। জীবত্বকে যাহারা নিরঞ্জন দিতে চাহ, ঐ নৈরঞ্জনা তীরস্থ পুণ্য বোধিবৃক্ষমূলে সেই পুণ্যাত্মাগণই যাইও। স্পর্শ পাইবে। দিব্য স্পর্শ পাইবে। নিমজ্জিত হইবে গভীর অতলে। শুদ্ধ বিরাট চিন্ময় ব্রহ্মচেতনায়। ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা—১৩৬৯।

জলপাইগুড়িতে নূতন মঠ

জলপাইগুড়ির সন্তানদের আন্তরিক আগ্রহ হইয়াছে তথায় একটি আশ্রম বা মঠ স্থাপন করিবার জন্য। সহর হইতে নাতিদূরে তাহারা কিছু জমিও ক্রয় করিয়াছে। পূর্ব্বে সাংসারিক দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া অথবা পরিণত বয়সে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তপস্যা প্রভাবে মানসিক শান্তি লাভের জন্য অনেকেই আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। যথা রাজা

সুরথ, তাঁহার আমাত্যবর্গ ও স্ত্রী পুত্রের দ্বারা ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া মানসিক শান্তিলাভের জন্য মেধস মুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধনী বৈশ্যের সমস্ত ধন তাঁহার পুত্র কলত্র ও আত্মীয়গণ বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তাঁহাকে নির্য্যাতিত করিলে তিনিও মানসিক শান্তি লাভের জন্য রাজা সুরথের সাহচর্য্যে মেধস মুনির আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শাপগ্রস্ত সীতা ভগবান রামচন্দ্রের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে মানসিক শান্তি লাভের জন্য মহামুনি বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে অর্থাৎ ভারতের বৈদিক যুগে আদর্শ ঋষিদের বাসগৃহকেও আশ্রম বলা হইত। তথায় শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের জন্য বিদ্যার্থীগণ সমিধ্‌পাণি হইয়া উপস্থিত হইত। পবিত্র জীবন যাপন করিয়া বেদাদি শাস্ত্র তাহারা অধ্যয়ন করিত। ঋষিগণ অধ্যাপনায় ও তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। মানুষের জীবনকেও তখন ঋষিগণ চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাহার প্রত্যেকটি বিভাগকে আশ্রম বলা হইত। যথা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস আশ্রম। আশ্রম মানেই আশ্রয় স্থল। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের আশ্রয় লইয়া অন্যূন চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে কঠোর সংযমে জীবন যাপন করিয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল তাহারই নাম ছিল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ছিল গার্হস্থ্যাশ্রমের। উচ্ছৃঙ্খল গৃহী নহে, পিতামাতার সেবা করিবার জন্য, অতিথির সেবা করিবার জন্য, দেবতার সেবা করিবার জন্য, সমাজের সেবার জন্য সহধর্ম্মিণীর সহায়তায় ঋষিগণ পবিত্র আদর্শ গৃহস্থজীবন যাপন করিতেন। গার্হস্থ্য

৮

আশ্রমে যেটুকু ভোগবিলাস থাকিত তাহাও ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে সকল শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সেই শাস্ত্রের মর্ম্মবাণী জীবনে রূপ দিবার জন্য তাঁহারা তপস্যায় নিমগ্ন হইতেন। নগরের প্রান্তদেশে লোককোলাহলের বাহিরে একান্ত স্থানে এইরূপ বাণপ্রস্থিগণ কুটীর বাঁধিয়া তপস্যা করিতেন। এই আশ্রমের নাম হইত বানপ্রস্থাশ্রম। তাহার পরে আরম্ভ হইত সন্ন্যাস জীবন। ইন্দ্রিয়ের শিথিলতার জন্য এই সন্ন্যাস নহে। পরমরসকে পাইয়া বিষয়রসকে মন ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইতেও একেবারে মুছিয়া ফেলিতেন শুদ্ধ নিষ্কল ব্রহ্ম সত্তায় একান্তভাবে অবস্থানের জন্য যত্নবান থাকিতেন এই সন্ন্যাসীগণ। ভারতীয়দের জীবনের আদর্শ ছিল এই পরমরসকে লাভ করা। যে রস লাভ করিলে বিষয়রস অতি তুচ্ছ বোধ হয়। রসগোল্লার রস যে আস্বাদন করিতে পায় সে যেমন চিটেগুড় খায় না সেইরূপ আত্মরসের সন্ধান যাহারা পায় তাহারা বিষয়রসে আর নিমগ্ন থাকে না।

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য মহামুনি মেধসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু বর্ত্তমান কালের আশ্রমগুলির অধিকাংশই বিষয়ীর সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আত্মার সেবা না করিয়া দেহের সেবা করাই তাহাদের লক্ষ্য হইতেছে। বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ মানুষই দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ইন্দ্রিয় সুখে লোলুপ। তাই তাহাদের দেহের ও ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি বিধানের জন্যই যে সকল আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকেই তাহারা অর্থ ও মর্য্যাদা দান করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞানের স্পৃহা বর্তমানে খুবই কম লোকের আছে। তাই যাহারা আত্মজ্ঞান জন্য আশ্রম করিতে চায় তাহাদিগকে

বহু বিষয়ে চিন্তা করিয়া কাজে আগ্রসর হইতে হইবে।

জলপাইগুড়ির আশ্রমও যদি লোকরঞ্জনের জন্য, শুধু মানুষের দেহের সেবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে আশ্রমকে আশ্রম নাম না দিয়া সেবাসদন প্রভৃতি নাম দিলেই উত্তম হইবে। হাঁসপাতাল হইলে রুগিগণ আশ্রয় পাইবে। প্রসব ব্যথা হইলে প্রসূতিগণ আসিয়া আশ্রয় পাইবে। অন্ধ, আতুর, বধির ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থগণ আসিয়া তথায় আশ্রয় পাইবে। ইহাই যদি তোমাদের আশ্রমেরও মূল উদ্দেশ্য হয় তবে তাহাকে আশ্রম নাম না দেওয়াই আমি সঙ্গত মনে করি। দিলেও তাহাকে দেবসঙ্ঘ নাম না দিয়া—অনাথ আশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, অবলাশ্রম অথবা হাঁসপাতাল বা সেবাসদন নাম দেওয়াই সঙ্গত।

সেবাসদন বা হাসপাতাল প্রভৃতির প্রয়োজন নাই এ কথা আমি বলিতেছি না। আমি বলিতেছি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা উচিৎ। যেমন গাঁজার দোকানে কখনও সোনা বিক্রয় হয় না এবং সোনার দোকানে কখনও আলু পটল বিক্রয় হয় না। আলু পটল বা গাঁজা প্রয়োজনীয় জিনিষ হইলেও তাহা সোনার দোকানে কখনও পাওয়া যায় না। সোনার দোকানে সোনাই পাওয়া যায়। অবশ্য সোনার দোকানে খরিদ্দার কম। তথায় লাইন দিয়া দাঁড়াইতে হয় না। সেইরূপ আশ্রমেরও একটা মহান উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যকে জলাঞ্জলী দিলে চলিবে না। তথায় ভীড় কম থাকিলেও তাহা অনাদর্শ স্থান হইবে না। আত্মজ্ঞান লাভই, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই, দিব্য জীবন যাপন করাই, মানসিক বিশ্রান্তি লাভ করাই আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য হইবে। এই মূল উদ্দেশ্যকে জীবনে রূপ দিতে হইবে। শুধু খাতা

পত্রে অথবা সাইনবোর্ডে লিখিয়া দিলেই চলিবে না। দিব্য-জীবন লাভের পথে লোককল্যাণকর কার্য্য বর্জ্জনীয় নহে বরং গ্রহণীয়। আধ্যাত্ম জীবন লাভের সঙ্গে সঙ্গে লোককল্যাণকর কার্য্য দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া তপস্যার পরিপন্থী না হইলে আশ্রমের সঙ্গে তাহাও রাখিতে হইবে। যে কর্ম্মদ্বারা অন্তর স্বচ্ছ হয়, যে কর্ম্মের দ্বারা আসক্তি শিথিল হয়, অনু-রাগ, বিদ্বেষ প্রশমিত হয় সেইরূপ জনকল্যাণকর কার্য্য কিছু কিছু থাকিবে। লোকরঞ্জনের জন্য নহে লোককল্যাণের জন্য। জনসেবা না করিলে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইবে না, নাম যশ হইবে না, অর্থাগম হইবে না, এইরূপ মানসিক দুর্ব্বলতাবশে যদি আশ্রমে লোকরঞ্জনের ব্যবস্থা থাকে তবে বুঝিতে হইবে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্য হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছ। তোমা-দের দৃষ্টি বাহিরে, অন্তরে নহে। এইরূপ লোকরঞ্জন কর্ম্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করা দূরের কথা চিত্তও শুদ্ধ হইবে না। লোকরঞ্জন বাসনার মধ্যে থাকে চিত্তের বিকার। অনেক আদর্শবাদী মানুষের পতন হয় এইরূপ লোকরঞ্জন কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে থাকিয়া। তাহারা জীবনের লক্ষ্যকে হারাইয়া ফেলে, দিগভ্রান্ত হয়। শুধু লোকরঞ্জন কর্ম্মের জন্য পিতামাতা ও পরিজনের সেবা বর্জন করিয়া তথাকথিত সাধু সাজিবার কোন সার্থকতাও নাই। দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ সাধুগণ পরে অনুতপ্ত হয়।

আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তোমাদের দুইটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটি দেওঘরে; অপরটি কলিকাতার নিকট কোন্নগরে। উত্তরবঙ্গে একটি আশ্রম হইলে তথাকার সন্তানদের একটি আশ্রয়স্থল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে

আশ্রম আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই একটি আশ্রয়স্থল। মানসিক দুঃখ দূর করিবার জন্যই একটি আশ্রয়স্থল। যাহারা জীবন প্রভাতে সংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তথায় আশ্রয়প্রার্থী হইবে এবং অলস জীবন যাপন না করিয়া তপস্যা এবং কর্মে নিমগ্ন থাকিবে সেইরূপ চরিত্রবান তরুণদেরই ঐ আশ্রম প্রধান আশ্রয়স্থল হইবে। যাহারা সংসার পথে চলিতে চলিতে পথশ্রান্ত হইবে, সংসার মরুভূমিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তৃষ্ণাতুর হইবে তাহাদেরও আশ্রয়স্থল হইবে এই আশ্রম। উদ্দেশ্য হইবে তপস্যা, ভোগ নহে। সংসারে ভোগের সাধ মিটিল না, তথায় সেবা যত্ন করিবার লোকের অভাব, তাই জীর্ণ, রুগ্ন দেহ লইয়া আশ্রমে তপস্বীদের গলগ্রহ হইব এইরূপ ইচ্ছা লইয়া কেহ যেন আশ্রমে বসবাস করিতে না আসে। পূর্ব্বে অর্থাদি দান করিয়া আশ্রমকে পরিপুষ্ট করিয়াছি অতএব তপস্যা না করিলেও আশ্রমে আমাকে স্থান দিতেই হইবে এবং আমার সেবা করিতেই হইবে এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়াও কেহ আশ্রমে আসিও না। জীর্ণ কঙ্কাল দেহ দিয়া, হাড় ও মাংসের টুকরা দিয়া নহে, আশ্রমকে তপস্যা দ্বারাই পুষ্ট করিবে, এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প যাহাদের থাকিবে তাহারাই আশ্রমে গ্রহণীয়।

আশ্রমের শান্তি নানা দিক হইতে ব্যাহত হয়। ফুলে যেমন কীট থাকে আশ্রমেও সেইরূপ কপটমতি লোক আসিয়া জুটে। তপস্বিগণ তপস্যায় নিমগ্ন থাকিলে ঐরূপ কপটাচারিগণ আশ্রমের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ব্রহ্মই আশ্রয়। আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির আত্মাই আশ্রয়, মাতৃ-নিষ্ঠ তপস্বীর মা'ই পরম বান্ধব।

মনে রাখিও মহাপুরুষদের কাছে সকল মানুষই আত্মজ্ঞান

লাভের জন্য আসে না। সকল মানুষ কেন, সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে দুই চারিজনই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আসে। তাহারাই অর্থাৎ ঐ দুই চারিজনই আশ্রমের পরম বান্ধব। ধনীর ধনে দৃষ্টি রাখিও না, যশস্বী লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্যগ্র হইও না, ত্যাগী, সংযমী, ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বীকে আশ্রমে স্থান দিও। দিনান্তে যদি তাহারা একটি রুটী খায়, সংবাদ পত্রে যদি তাহাদের নাম কখনও প্রকাশিত না হয় তবু তোমরা বিচলিত হইও না। বহুধনে আশ্রমকে ধনবান করিতে চেষ্টা করিও না। বহির্মুখী রাজনীতিজ্ঞগণকে তথায় আমল দিয়া আশ্রমকে তথাকথিত গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টা করিও না। দৃষ্টি অন্তরে রাখিও। অন্তরনিধির ধ্যানে নিমগ্ন থাকিও। বাহিরের সকল সমস্যাই দূর হইবে। নিত্যযুক্ত তপস্বীর যোগক্ষেম তিনিই বহিয়া থাকেন।

তবে আনুসঙ্গিক কর্ম্ম হিসাবে জাতি গঠনের জন্য চরিত্রবান ছাত্রদিগকে নিয়া ছাত্রাবাস গঠন করিতে হইবে। কতজন ছাত্র তাহাতে থাকিবে তাহা কমিটি হইতে নির্ণয় করিয়া লইবে। আশ্রমে সর্ব্বদাই নিরামিষ আহার করিতে হইবে। ছাত্র ও অতিথিগণ আহারে বিহারে আশ্রমের নীতি মানিয়া চলিবে। আশ্রমে একটি ঔষধালয় রাখিবে—আশ্রমের কল্যাণার্থে তথা অগন্তুক রোগীদেরও কল্যাণের জন্য। পুস্তকালয় অবশ্যই থাকিবে। আর থাকিবে আশ্রমের আদর্শে একটি আড়ম্বরহীন মন্দির। মন্দিরে যে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিবে তাঁহার নিত্য সেবারও ব্যবস্থা থাকিবে কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে।

দেওঘর আশ্রমে যিনি আচার্য্য থাকিবেন তিনিই প্রত্যেক শাখা আশ্রমেরও আচার্য্য থাকিবেন। তবে শাখা আশ্রমেও

আচার্য্যের দ্বারা বা কমিটির দ্বারা নিযুক্ত একজন পরিচালক থাকিবেন। আচার্য্যের নির্দ্দেশ ভিন্ন অন্য কাহারও দীক্ষাদানের অধিকার থাকিবে না। আচার্য্যের নির্দ্দেশেই প্রত্যেক আশ্রম পরিচালিত হইবে। আচার্য্যের বিরুদ্ধে কোন ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ করিতে হইলে তাহা কমিটির মেম্বারদিগকেই জানাইতে হইবে। জনসাধারণের মধ্যে তাহা নিয়া হট্টগোল করা চলিবে না। কোন গুরুভাই যদি আশ্রম আচার্য্য হন তবে তাহাকে গুরুর ন্যায়ই সম্মান করিতে হইবে। বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও তাহাকে কোন প্রকারে অমর্য্যাদা করা চলিবে না। এ সকল বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে।

প্রধান কথা হইল জলপাইগুড়ির আশ্রম গঠনকারিগণকে দৃঢ়ভাবে মনে রাখিতে হইবে তাঁহারা তপস্যার জন্যই আশ্রম গঠন করিতেছেন। তপস্যার দ্বারাই মানবজাতির বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। তপস্বী শুধু নিজের কল্যাণই করেন না। তাঁহার শুদ্ধ চিন্তায় আকাশ বাতাস শুদ্ধ হয়। ইথার তাঁহার চিন্তাশক্তিকে বহন করিয়া বিশ্বের কল্যাণ সাধন করে। আত্মচিন্তাই আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য, অন্যান্য যাহা কিছু সকলই তাহার আনুসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। আশাকরি তোমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়ার জন্য তথা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছ। মা তোমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা—১৩৬৯।

ওগো দুর্গা তোমায় বলি

বর্ষ ব্যাপিয়া যাঁহার চিন্ময় বক্ষে গুপ্ত সাধনায় মগ্ন থাকি, বর্ষ ব্যাপিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে দিব্য বস্ত্রের অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত হইয়া যে আমার সঙ্গে গুপ্ত প্রেমের গুপ্ত অভিনয় করে, বর্ষ ব্যাপিয়া যে আমার দহর আকাশে অবস্থান করিলেও আমার ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্য দিয়া অনন্ত নামরূপের রসাস্বাদন করে ও করায়, বর্ষ ব্যাপিয়া যে অমূর্ত্ত জগতে লুকাইয়া লুকাইয়া এই মূর্ত্ত বিশ্বকে নিয়া পুতুল-খেলা খেলে, বর্ষ ব্যাপিয়া যে আমার ইন্দ্রিয়বর্গের তলায় তলায় থাকিয়া আমাকে দেখিতে বলিতে ও শুনিতে দেয়, বর্ষ ব্যাপিয়া যে অনন্ত নামরূপে রূপায়িত হইয়া আমাকে বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধের আস্বাদনে সুখ দুঃখের উপহার প্রদান করিয়া ক্ষণে হাসায় ক্ষণে কাঁদায়, আমার হৃদয় রাজ্যের সেই গুপ্ত রাণী আবার বর্ষান্তে মূর্ত্ত হইয়া আমাদের এই পূজা মণ্ডপে আসিতেছে। গুপ্ত সাধনার গুপ্ত রসে, গুপ্ত ক্রীড়ার গুপ্ত কৌতুকে তাহার আশা মিটে না, তাই বর্ষান্তে চিদাম্বর হইতে এই বিশ্বাম্বরে বিশ্বেশ্বরী জননী হইয়া—বরদা হইয়া, অভয়া হইয়া—তাপহারিণী পাপহারিণী দনুজদলনী দুর্গা হইয়া আমাদের এই পূজা মণ্ডপে অবতীর্ণ হয়। যে অনন্ত ও অপার—সে শান্ত ও মূর্ত্ত হইয়া আসে। যে নির্গুণ ও নিরাকার—সে দয়াময়ী মাতৃস্নেহঘন সাকার মূর্ত্তিতে আসে। যে বাক্য ও মনের অগোচর—সে বাঙ্ময়ী হইয়া মনোময়ী হইয়া আমার মনের স্পন্দনে স্পন্দনে, আমার

বাক্যের ছন্দে ছন্দে হাসিতে বলিতে চলিতে, রঙ্গে ভঙ্গে মন মাতাইতে এই পূজামণ্ডপে আবির্ভূত হয়। যে দিগ্বসন সে আসে বসনে ভূষণে ভূষিত হইতে। যে নিত্য-শুদ্ধ সে আসে মন্ত্রপূত বারিতে অভিষিক্ত হইতে। যে বিশ্বের অন্নদায়িনী সে আসে আমার তুচ্ছ ক্ষুদ্র ভোগ ও নৈবেদ্য গ্রহণ করিতে—সে আসে দশবাহু সমন্বিত হইয়া আর্ত্ত পুত্রকে রক্ষা করিতে—আয়ুধধারিণী, দনুজদলনী দুর্গা মূর্ত্তিতে। সে আসে কণ্ঠে মালা পরিতে, সে আসে শিরে রক্তিম সিন্দুর বিন্দু ধারণ করিতে, সে আসে পাদ্য অর্ঘ্য ঐ অভয় রাঙ্গা চরণে গ্রহণ করিতে। হৃদয়ে-দোলায় দোল দিতে দিতে অনাহত নাদের তালে তালে নাচিতে নাচিতে সে হৃদয়ের গুপ্ত কক্ষ হইতে এই পূজামণ্ডপে, প্রেমঘন বরদা মূর্ত্তিতে বর্ষে বর্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। দুর্গা দুর্গা বলিলে, মা মা বলিলে সে মহামোহের ও দুঃখ দৈন্যের সহস্র নিষ্ঠুর জালকে ভেদ করিয়া শান্তি প্রদায়িনী মূর্ত্তিতে আমার পূজামণ্ডপে আসিয়া অধিষ্ঠিত হয়। "চণ্ডিকে, চল চল চালয় চালয়; শীঘ্রং পূজালয়ং প্রবিশ" বলিলে যে দ্রুত পদ সঞ্চারণে বর্ষে বর্ষে পূজামণ্ডপে অবতীর্ণ হয়, আবার "গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং, স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে," বলিলে যে বাহ্যরূপ হইতে অন্তর্হিত হইয়া হৃদয় গুহার গুপ্ত কক্ষে ভাব সমুদ্রের অতল তলায় ডুবিয়া যায়, সেই মঙ্গলা শুদ্ধা কলাতীতা জননী আজ অবতীর্ণ হইতেছে তাহার দিব্য রাজ্য হইতে তোমাদের এই পূজা মণ্ডপে।

বিগত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই রসময়ী জননী এমনি ভাবে আমার সাথে রঙ্গে ভঙ্গে খেলিয়াছে ও খেলিতেছে। এমনিভাবে আমার ইচ্ছায় অনিচ্ছায়

নানাস্থানে ও দেশদেশান্তরে পূজার বেদী রচনা করাইয়াছে, এমনি ভাবে 'তুর্গা' বলাইয়াছে, এমনি ভাবে 'মা' বলাইয়াছে। এমনি ভাবে সোহাগভরে বক্ষে তুলিয়া চুম্বনে চুম্বনে মনে প্রাণে ও দেহের প্রতি অণুতে অণুতে পুলক সঞ্চার করিয়াছে। এমনি ভাবে শ্রান্ত ক্লান্ত শুষ্ক মুখে পীনোন্নত পয়োধর চাপিয়া অমৃত ঢালিয়া দিয়াছে। এমনি ভাবে ক্ষত বিক্ষত দেহে ও মনে প্রেম বিগলিত অশ্রুধারায় সঞ্জীবনী সুধা সিঞ্চন করিয়াছে।

যে হাতছানি দিয়া অমৃতত্ব প্রদানের আশায় প্রলুব্ধ করিয়া নবীন বয়সে আমায় ঘরের বাহির করিয়াছিল, সেই যাযাবরের ন্যায় দেশ দেশান্তরে কতই না ঘুরাইয়াছে। বর্ষান্তে সেই অচেনা দেশে সেই অজ্ঞাত কুলশীলদের মাঝখানে আমার চিদাকাশ হইতে চিত্তাকাশে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছে —'সকল নূতনের মাঝে তোমার পুরাতন সাথী আমি আছি তোমারই সাথে সাথে। এই দেখ আমি আসিয়াছি। আবার পূজিত হইব, অর্চ্চিত হইব, হোম বহ্নির পূতগন্ধে আমোদিত হইব, এইবার এইখানেই এই একান্ত অচেনা স্থানেই পূজার বেদী রচনা কর।' জীবনের ইহা এক গৌরবজ্জ্বল পরিহাস।

আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি নাই। তাঁহার ইচ্ছা স্রোত-তৃণের মত আমাকে ভাসাইয়া নিয়া চলিয়াছে। তাই দেশে দেশে বেদী রচনা করিয়াছি, তাই দেশে দেশে মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়াছি। আর দেখিয়াছি—অচেনাদের মুখে মুখে বুকে বুকে আমার এই চিরপরিচিত রহস্যময়ীকে। দেখিয়াছি মানুষের মাঝে দেবতাকে, দেখিয়াছি শক্তিকামী ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুকে, দেখিয়াছি আত্মত্যাগী দধীচির ন্যায় দেশভক্তকে। আবার দেখিয়াছি—মানুষের মাঝে কত দাম্ভিক অসুরকে, মানুষের মাঝে কত

হিংস্র শ্বাপদকুলকে। দেখিয়াছি মানুষবেশধারী দেশদ্রোহীকে, পুলিশের গুপ্তচরকে। দেখিয়াছি পৈশাচিক সাম্প্রদায়িকতার রক্তাক্ত পরিণাম—ব্যথিত হইয়াছি, ভীত হইয়াছি। ধর্ষিতা নারীর আর্ত্তনাদ পলে পলে শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি—মন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে; দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত্তের হৃদয় বিদারক ক্রন্দন শুনিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে নরনারায়ণ জ্ঞানে আর্ত্তের সেবায় ছুটিয়া গিয়াছি। ইহা কি বীভৎস, কি ভয়াবহ, কি কলঙ্কিত নারকীয় ছবি দেবী তোমার! এই হলাহলময় বিশ্বকে দেখিয়া, এই নরঘাতক পিশাচদিগকে দেখিয়া সেই কবিকে বহুবার ধিক্কার দিয়াছি—যে বলিয়াছিল—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" সকল মানুষ সত্য নহে, সকল মানুষই সত্যদ্রষ্টা ঋষি নহে। আশান্ত হইয়াছি, অধীর হইয়াছি, বিক্ষুব্ধ হইয়াছি পশুতুল্য মানুষকে দেখিয়া। হৃদয়ের মাঝখানে দাবানল জ্বলিয়াছে। সেই বহ্নিতে আহুতি দিয়াছি, লবণাক্ত অশ্রুতে তর্পণ করিয়াছি। ইহা তামসিক মোহাচ্ছন্ন মূর্ত্তি তোমার। সেই দুর্দ্দিনে আমোদ করিতে, আনন্দ করিতে, ভাবাবেগে ঢলিয়া পড়িতে—দুর্গা তোমাকে ডাকি নাই। জ্বালাময়ী ভাষায় উগ্র মন্ত্রে তোমাকে বলিয়াছি—ডাকিনী শাকিনী ঘোরা। ত্বং মহামায়া মহামোহা মহাসুরী। ওঃ! কি ভয়ঙ্করী তুমি। আবার তোমার শান্ত চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছি "ত্বং শ্রী স্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধি বোঁধ লক্ষণা।" আবার বলিয়াছি, "শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।" ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি রণরঙ্গিনী দনুজদলনী ভৈরবী তোমাকে, ক্ষণে দেখিয়াছি তুমি উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা ও চণ্ডনায়িকা। সেদিনের পূজাক্ষেত্রে সৌম্যারূপে তোমাকে পাই নাই, পাইতে অভিলাষীও হই নাই।

সেইদিন আসিয়াছিলে দৈত্য-দানব-দর্পহা মূর্ত্তিতে, বিচূর্ণ করিতে যত ভেদ বিবাদে। কখনও নির্জ্জন পল্লীতে বা উত্থানে সামান্য অর্থ ও লোকবল লইয়া দেশমাতৃকার শৃঙ্খলভার মুক্তির জন্য ডাকাইয়াছ, কাঁদাইয়াছ। দেশের বরপুত্রদের অভ্যুত্থানের জন্য, কারামুক্তির জন্য উষ্ণ অশ্রু সলিলে আচমনীয় গ্রহণ করিয়াছ। আমার তপস্যালব্ধ ঋদ্ধি ও সিদ্ধির বিনিময়ে চাহিয়াছ পরাধীন ভারতের মুক্তি, চাহিয়াছ পরাধীন বিরাট জাতির অভ্যুত্থান। চাহিয়াছ দৈত্যদের দেহনাশ, ভক্তদের অভয় ও দেবতাদের হিত। অন্তরে দোল দিয়াছ ভাগ্য বিধাত্রী বিশ্বেশ্বরী বিশ্ব-প্রসবিনী ঈশানী তুমি। কত প্রান্তরে, কত উদ্যানে, কত স্কুলগৃহে, কত চৌতলার ছাদে, কত ধর্ম্মশালায় ঘুরিয়াছি—ঘুরাইয়াছ ভবানী তুমি। ভব কারাগার হইতে বিমুক্ত করিবার অভিলাষ জাগাইয়াছিলে যাহার অন্তরে—তাহাকে আবার যাযাবরের ন্যায় ঘুরাইয়াছ কত নব নব উন্মাদনা অন্তরে জাগাইয়া, নূতন মন্ত্রে নূতন তন্ত্রে ভারতের মুক্তি সাধনার উদ্‌গাথা বলিতে বলাইতে।

লোকে বলে আজ ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভার ছিন্ন হইয়াছে—বিদেশী শ্বেতকায়গণ দূর হইয়াছে। দেশী ঈষৎ গৌর ও কৃষ্ণকায়গণ সিংহাসন দখল করিয়াছে। তপস্বী বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীর জন্মভূমিকে বলি দিয়া লক্ষ লোককে বাস্তুহারা করিয়া, সহস্র সহস্র নারীকে গুণ্ডার হাতে উৎসর্গ করিয়া দেশমাতৃকার অঙ্গকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কতিপয় গর্ব্বিত যাদুকর ভারতের সিংহাসন দখল করিয়াছে। ক্ষমতাহীন শাসকদের অক্ষমতার জন্য দেশে সমাজে রাষ্ট্রে দুর্নীতি স্বেচ্ছাচার ব্যভিচার ও পাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাই বোধ হয় কাম কামীদের

প্রার্থনার দুর্লঙ্ঘ্য পরিণাম। নদীর এককূল ভাঙ্গে, অপর কূল গড়ে। কালের ও প্রকৃতির এই আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন তোমার এই বিশ্বের ন্যায়ই প্রবাহরূপে সত্য।

শত উন্মাদনার মধ্যেও মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিত গীতার গুপ্ত বাণী—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" আবার ভৈরব সুরে বাজিয়া উঠিত "মামেকং শরণং ব্রজ।" এবার হাতছানি নয়, হাতে হাতে ধরাধরি। প্রাণে প্রাণ বাঁধিয়া, হাতে হাত রাখিয়া, পর্ব্বতসম বাধাকে তৃণসম লঙ্ঘন করিয়া এবার চলিব সেই পরমধামে চরমধামে "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে"—যেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসে না। জগৎ খেলা তাসের ঘর—একদিকে গড়ে, অপর দিকে ভাঙ্গে। তাই বলি আর মোহমন্ত্রে সম্মোহিত করিয়া রাখিও না তুমি—কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে মোক্ষ প্রদায়িনী মূর্ত্তিতে বরাভয় মূর্ত্তিতে আসিয়া ভেদাভেদ ঘুচাইয়া স্থির ভাবে দাঁড়াও। অভিনয় পরিহার কর, রঙ্গমঞ্চের ভূষা ত্যাগ কর, এবার ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তিতে "স্থাং স্থিং স্থিরা ভব।" দীর্ঘ কতিপয় বৎসর যাযাবরের ন্যায় দেশে দেশে প্রান্তরে পর্ব্বতে সৈকতে অট্টালিকায় বৃক্ষলতায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এবার তুমি সৌম্যা হইয়া অশেষ সুন্দরী মূর্ত্তিতে প্রেমঘন বিগ্রহ হইয়া এই স্থির আসনে হৃদয় কমলে প্রতিষ্ঠিত হও। 'সম্বৎসর ব্যতীতেতু পুনরাগমনায় চ"—পুনরায় তুমি আসিও এমন স্নেহঘন মূর্ত্তিতে—আসিয়া পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করিও এই আমন্ত্রণ মন্ত্রও বহুবার বলিয়াছি। কিন্তু বিগত ত্রিশ বৎসর—কোথায় তুমি আসিবে, কোথায় তুমি পীঠভূমি রচনা করিবে, এই বিরাট বিশ্বের কোনখানে আসিয়া তুমি তোমার স্থির বেদী রচনা করিবে, তাহা বলিতে পারি নাই।

এই বিরাট বিশ্বে তোমার যাযাবর পুত্রের কোন স্থান ছিল না।

নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।

গৃহত্যাগী আমার গৃহ না থাকিলেও তোমার এই বিশ্ব ভুবনে তোমার অঙ্কে বসিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য, আমার শেষ শয্যা রচনা করিবার জন্য এই পুণ্য পীঠভূমিতে একদিন আসিয়া আমাকে কোলে করিয়া তুমি দাঁড়াইলে। দেখিলে অভিনয় করিতে করিতে অবসন্ন এই দেহ মন প্রাণ। তুমিও বুঝি ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত হইয়াছিলে? চরণ বুঝি তোমার কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছিল? তাই শ্রান্ত আমাকে বুকে ধরিয়া এই পুণ্য ভূমিতে আসিয়া আসন পাতিলে।

কত পর্ণ কুটীরে বসিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি, কত ভগ্ন কুটীরে বসিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি, উদ্যানে তোমাকে ডাকিয়াছি, কত পর্ব্বতে তীর্থে, কত অট্টালিকায় বসিয়াও তোমাকে ডাকিয়াছি। বিজয়ার বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া কতজন তোমাকে বিদায় দিয়াছে। আমিও 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিতে বলিতে ত্রিশ বৎসর যাযাবরের ন্যায় সেই স্থল ত্যাগ করিয়াছি। তোমার পদধুলিতে পূত সেই তপোভূমিতে বসিয়া ধ্যান ও সমাধির সুযোগ পাই নাই। তাই একদিন এই পীঠভূমিতে আসিয়া তুমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলে। এই সিদ্ধ পীঠভূমি পুরাণে উক্ত একান্ন পীঠভূমির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পীঠভূমি। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত তোমার শবদেহের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হৃদয় এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। এক জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গমূর্ত্তি অতীতে এই গভীর অরণ্য ভূমিতে লুক্কায়িত ছিল। শিব ও শক্তি সমন্বিত এই পীঠভূমিতে তুমি আবার আসিয়া মোক্ষ-ধামে মোক্ষদা মূর্ত্তিতে দাঁড়াইলে।

মনের গভীর গহন বনেও কখনও কল্পনা করি নাই—তুমি আমাকে বক্ষে চাপিয়া এই পুণ্য ভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্রোতের তৃণের মত তোমার ইচ্ছার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিলাম শুধু তোমারই পতাকা লক্ষ্য করিয়া, তোমার রাঙ্গা চরণ বক্ষে চাপিয়া, 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিয়া। তোমার বড় সাধ হইল তুমি এই পীঠভূমিতে বৈদিক যুগের আদর্শ লইয়া মোক্ষদা মূর্ত্তিতে 'হৈমবতী মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। পরাদেবীরূপে পরব্রহ্মরূপে অষ্টভূজা মোক্ষদা মূর্ত্তিতে তুমি আসিয়া এই পীঠভূমির এক দিব্য মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইলে। মোক্ষদা মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত লইলেও বর্ষে বর্ষে তুমি যেমন অবতীর্ণ হইতে বর্ষে বর্ষে যেমন তুমি বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে আসিয়া পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে সেই অমৃতায়মান অভিনয় হইতে বঞ্চিত কর নাই। দেহধারী পুত্রগণকে লইয়া তাহাদিগকে অমৃতায়মান করিবার জন্য তোমার এ অভিনয় সত্যই প্রেমঘন মাতৃত্বের গৌরবজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তুমি এমনি ভাবে না আসিলে, তুমি এমনি ভাবে ধরা না দিলে তোমার আগমনে ও বিসর্জ্জনে আনন্দ ও বিষাদের অভিনয় না থাকিলে বুঝি বা তোমার লীলা অপূর্ণই থাকিত। মোহমুগ্ধ মানুষ তোমাকে ধ্যানে সমাধিতে মন ও বুদ্ধির পরপারে শুদ্ধ দহর আকাশে দেখিতে পায় না, ধরিতে পারে না। তাই তুমি বৎসরান্তে তোমার সিংহাসনের আসন হইতে আর্ত্ত অজ্ঞ পুত্রদের মাঝে দেহধারী মাতৃমূর্ত্তিতে আসিয়া আবির্ভূত হও। ধন্য সেই ঋষি—যাঁহার হৃদয়ে তুমি এই ভাবময় মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া তাঁহাকে কৃতকৃত্য করিয়াছিলে। ধন্য সেই ঋষি যিনি মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীকে "প্রাণাঃ ইহঃ প্রাণাঃ বলিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া স্নেহঘন মাতৃ মূর্ত্তিকে দেখিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

রূপে রূপে প্রতিরূপে তোমাকে দেখিলেও, বিশ্বের স্থাবর জঙ্গমে তোমার সত্তাকে অনুভব করিলেও, অনন্ত নামরূপের পরম আশ্রয় তুমি—ইহা প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত হইলেও, প্রতি নামরূপের অন্তর ও বাহিরে তুমি চির-বিদ্যমান রহিয়াছ ইহা অনুভব করিলেও, অন্তরের প্রতি বোধের তলায় তলায় একমাত্র তুমিই বিদ্যমান রহিয়াছ—ইহা নিত্য অনুভব করিলেও, বিদ্যুৎ নিমেষবৎ তোমার দ্বন্দ্বাতীত স্বরূপের আস্বাদন পাইলেও, তোমার ও আমার মাঝে এখনও যেটুকু ব্যবধান রহিয়াছে তাহা দিনে দিনে বড়ই অসহনীয় বোধ হইতেছে। যেখানে অস্মিতা আছে, যেখানে আমি ও তুমি বোধ আছে, যেখানে মিলন ও বিরহের অভিনয় আছে, তথায় শাশ্বত শান্তি নাই। মিলনের গভীরতা যত আনন্দপ্রদ, বিরহের বিচ্ছেদ ততই পীড়া-দায়ক। অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের অবস্থাও যোগের পরকাষ্ঠা অবস্থা নহে। দ্বৈতাদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের অনুভূতি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। দরিদ্রের নিকট সহস্র মুদ্রাই লোভনীয়, কিন্তু ধনীর নিকট লক্ষ মুদ্রাও তুচ্ছ। যাহারা তোমার সন্ধান জানে না, যাহারা তোমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে কখনও নিমগ্ন হয় নাই, তাহাদের নিকট দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত অবস্থা লোভনীয় হইলেও যোগস্থ ব্যক্তির পক্ষে তাহা লোভনীয় নহে। কূপ ও তড়াগের জল ততদিনই মানুষ অনুসন্ধান করে যতদিন না বর্ষার প্লাবন আসিয়া একূল, ওকূল, দুকূল নিম-জ্জিত করিয়া দেয়। অভাব যেমন পীড়াদায়ক অবস্থা, ভাবও সেইরূপ প্রাপ্তি ও বিরহের উন্মাদনার জন্য এক ক্লেশদায়ক অবস্থা। অভেদে ভেদ কল্পনা করিয়া, চিরপ্রকাশে ছায়া কল্পনা

করিয়া, চির অদ্বৈতে দ্বৈত কল্পনা করিয়া যুগযুগান্তর লোক লোকান্তর অভিনয় করা যে কত ক্লেশদায়ক—তাহা একমাত্র তুমি যাহাকে জানাও সেই জানে। আশ্চর্য্য তোমার এই জগৎ রচনা, আশ্চর্য্য তোমার এই অসীমের মধ্যে সীমার কল্পনা। আশ্চর্য্য তোমার চিন্ময় বিরাট বক্ষে অবস্থান করিলেও এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহং-এর কল্পিত ছায়ার উৎপত্তি। আশ্চর্য্য তুমি, আশ্চর্য্য তোমার এই জগৎ অভিনয়। তোমার আনন্দ স্বরূপের মাঝে আশ্চর্য্য এই দুঃখ দাহন পীড়ন রোগ শোক সন্তাপ। থাক তুমি তোমার এই অশ্চর্য্য কৌতুক লইয়া।

শোন আজ—দলিত মথিত মর্ম্মের মর্ম্মকথা। আমি সুরথের ন্যায় ভ্রষ্টরাজ্য ও রাজসুখ চাহি না, আমি কামকামী নহি। আমি উগ্র তপস্বী সমাধির ন্যায় সমাধিস্থ হইয়া আত্মজ্ঞ ঋষিদের বাঞ্ছিত স্থানে অবস্থান করিতে চাহি। সবিকল্প ভূমি চাহি না; বিতর্ক বিচার আনন্দ ও অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ চাহি না, তোমার সঙ্গে আর দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের অভিনয় করিতে চাহি না। যাহারা চাহে তাহাদিগকে নিয়া তুমি যুগযুগান্তর আরও অভিনয় কর। আমি আমার শেষকে জানিয়াছি। এই শেষের সঙ্গে নিঃশেষে আমি মিশিয়া যাইতে চাহি। আমি আমাকে হারাইয়া তোমাকে পাইব, আবার তোমাকে হারাইয়া আমার পূর্ণতর 'আমাকে' পাইব, আমি ও তুমি অভেদ হইব। ওগো দাও—সেই চিন্ময় বিরাট বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দাও। ওগো দাও—সেই সুশীতল শান্ত বুকখানায় নিমজ্জিত করিয়া দাও, ওগো দাও—গভীরে আরও গভীরে—অনন্তে আরও অনন্তে

১০

নিঃশেষে মিশিয়া যাইতে দাও। আমি 'তুর্গা' 'তুর্গা' বলিয়া তোমাকে শেষবারের মত বক্ষে তুলিয়া লই, তুমিও 'পুত্র' 'পুত্র' বলিয়া তোমার অভিনয়ের যবনিকা পাত কর। ধন্য হই, কৃতকৃত্য হই। সফল হউক আমার হেথায় আসা, সফল হউক আমার 'মা' বলে ডাকা, সফল হউক তোমার তুর্গা নামের মহিমা, সফল হউক আমার ঈশানী বলা, সফল হউক আমার ব্রহ্মময়ী বলা, সফল হউক আমার মোক্ষদা বরদা জ্ঞানদা প্রেমদা হ্লাদিনী বলা। আবার আমি ভূলুণ্ঠিত হইয়া কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া শেষ নিবেদন জানাইতেছি—

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি! বিশ্বার্ত্তিহারিণি!
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে! লোকানাং বরদা ভব॥
প্রসীদ ভগবত্যম্ব! প্রসীদ ভক্তবৎসলে!
প্রসাদং কুরু মে দেবি! তুর্গে! দেবি! নমোঽস্তু তে॥"

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

শ্রীশ্রীতুর্গা পূজা—১৩৬৯।

সীমার মাঝে অসীম

শ্রীভগবানের যে কোনও মূর্ত্তি সামনে লইয়া তাঁহার স্তব গান করিতে করিতে এবং অর্চ্চনা করিতে করিতে যখন প্রাণার্ঘ্য নিবেদন করিতে থাকি ঐ দেবতার দিব্য চরণকমলে তখন তিনি শ্রীমণ্ডিত হইয়া—জীবন্ত হইয়া এক নবরূপে ফুটিয়া উঠেন আমাদের চোখের সামনে। চোখে দেখি তখন তাঁহার দিব্য রূপ, বরবপু। সে দিব্য রূপ হইতে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে লাল, নীল, সাদা আরও কত বর্ণের জ্যোতি। তন্ময় হইয়া তখন শুনিতে পাই তাঁহার চরণের নূপুর ধ্বনি ও তাঁহার মোহন বংশীধ্বনি। ইহাই অনাহত নাদ। হৃদয় পদ্ম হইতে এই ধ্বনি আসে—কর্ণে করে অমৃত বর্ষণ। প্রতি অঙ্গে আনন্দের লহরী খেলিতে থাকে তাঁহার মধুময় স্পর্শে। হৃদয়ের সঙ্গে ঐ দিব্য রূপের এক মধুময় সংযোগ ঘটে। তিনি হৃদয় স্পর্শ করিয়া কানে কানে বলেন—আমি আসিয়াছি। অসীম হইতে সীমার মধ্যে আসিয়াছি। নিত্যধাম হইতে লীলা করিতে—খেলিতে তোমার কাছে আসিয়াছি এই রূপের মধ্যে। আমি তোমাদের হৃদয়েই লুকাইয়া থাকি। চোখে অশ্রু-গঙ্গা প্রবাহিত হইলে আমি আসি প্রেমের তরণী বাহিয়া। এই দেখ আমার দিব্যরূপ ; এই দেখ কত কান্তি আমার রূপে। ঐ শুন রুণু রুণু বাজে আমার নূপুরের ধ্বনি। শুন আমার মধুময় আহ্বান। নিভৃত তোমারই হৃদয়ে ঐ অনাহত ধ্বনিতে আমি আহ্বান করি বার বার তোমাদিগকে। তোমরা চঞ্চল থাক বলিয়া এই আহ্বান শুনিতে পাও না। ঐ হৃদয় গুহায় প্রবেশ করিবার পথও পাও না। তাই হৃদয় হইতে আমিই বাহির

বিশ্বে আসি। অরূপ আমি রূপের মধ্যে আসিয়া আবির্ভূত হই। ধর আমার হাত, কণ্ঠ বেড়িয়া সংলগ্ন হও আমার ঐ দিব্য বক্ষে। তুমি শুধু দাস নহ, তুমি শুধু পুত্র নহ, তুমি শুধু বন্ধু নহ, তুমি যে আমার আপন হইতেও আপন। তুমি যে আমার অংশ। তরঙ্গের সাথে সাগরের যে সম্বন্ধ তোমার সাথে আমার সেই সম্বন্ধ। তুমি ও আমি অভিন্ন হইলেও খেলিবার জন্য, লীলা করিবার জন্য এই ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছি। হাতে হাত দাও, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাও। আমার নিবিড় পরশে ভুলিয়া যাও জন্ম-জন্মান্তরের গ্লানি, দুঃখ, দৈন্য ও সন্তাপ।

তাঁহার দিব্য রূপ দেখিয়া, তাঁহার বরবপুর স্পর্শ পাইয়া আমি ধীরে ধীরে যেন কেমন হইয়া যাই। অবশ হয় শরীর, শিথিল হয় ইন্দ্রিয় বর্গ, মন স্তব্ধ ও শান্ত হয়। ইন্দ্রিয় বর্গ অবশ হইলে, মন শান্ত ও পবিত্র হইলে তিনি প্রবেশ করেন আমার মধ্যে। আমার সীমাবদ্ধ অহঙ্কার, আমার ব্যষ্টি জীব-বোধ লুপ্ত হইতে থাকে তাঁহার আবির্ভাবে। লুপ্ত হইতে থাকে দেহ গেহ ইন্দ্রিয়বর্গ ও মন। সব অতলে ডুবিয়া যায়। ঐ দিব্য পুরুষ তাঁহার রূপের সীমা ছাড়িয়া অসীম অনন্ত হইতে থাকে আমার বোধে, মনের ঊর্দ্ধে। দিব্য দোলনায় দুলাইতে দুলাইতে তরঙ্গের ন্যায় নাচাইয়া নাচাইয়া আমাকে মিলাইয়া লইতে থাকে তাঁহার অসীম অনন্ত আনন্দ স্বরূপে। তরঙ্গ হারাইতে থাকে সমুদ্রে, আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন তিনি তাঁহার বিরাট সত্তায় আমাকেও মিলাইয়া লইতে থাকেন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখি। রূপে রূপে প্রতি রূপে উদ্ভাসিত হইতে থাকে সেই অসীমের দিব্য রূপ-মাধুরী। রূপে রূপে মধুর অনুলেপন দেখিতে পাই। প্রতিরূপ তাহার কাঠিন্য হারাইয়া এক দিব্যরূপ

ধারণ করে। নিকটে যাহা দেখি, অতি দূরেও যাহা দেখি তাহাতে কাঠিন্য দূর হইয়া এক স্নিগ্ধ শান্ত ভাব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনই বলিতে থাকি— নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,

অথবা যেদিকে ফিরাই আঁখি,
অন্তরে বাহিরে সদাই দেখি
তব দিব্য রূপ মনোহর।

জগতের প্রতিরূপ তখনই অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়। প্রতিরূপের ভিতরে ও বাহিরে শোভা পায় এক দিব্য ও চিন্ময় কান্তি। অপূর্ব্ব সেই সুষমা। শুধু বাহিরেই দেখি না, শুধু দূরেই দেখি না, অন্তরে নিভৃতে হৃদয় গুহায়ও অনুভব করি এই চিন্ময়কে। ছোট হইয়া তিনি তখন থাকেন না। ছোট করিয়া আমাকেও রাখেন না। ঐ অন্তর রাজ্যে বসিয়া তিনি তখন বলিতে থাকেন—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্।"—আমি যে ভূমা, আমি যে রসময়, আমি যে সত্য শিব সুন্দর! তোমরা একবার রূপে রসঘন চিন্ময় বিগ্রহরূপে দেখিলে আমি আমার রস-সমুদ্রের উৎস খুলিয়া দিই। রূপ দেখিয়া তখন তৃষ্ণা মিটে না। অরূপে অবগাহন করিতে চাহ। অসীম আমি, আমাকে সীমার মধ্যে পাইয়া ঐ পিপাসা মিটিবে কেন? ক্ষুদ্র কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত যাহারা তাহারা আমাকে সীমার মধ্যে দেখিয়াই মুগ্ধ হয়, লুব্ধ হয়। কিন্তু যাহারা শুধু আমাকেই চাহে, তাহারা সত্যই পরবৈরাগ্যবান, তাহারা অসীম অনন্ত ও অতল রসসমুদ্রে অবগাহন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। রূপহীন রস-সমুদ্রে ডুবিয়া আমার প্রিয়তম ভক্ত মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা—১৩৬৯।

ব্রহ্মনিষ্ঠের সরস্বতী পূজা

একই নদীর জল দিয়া কেহ মুখ ধোয়, কেহ হাত পা ধোয়, কেহ অন্ন ব্যঞ্জন রান্না করে, কেহ বা গৃহমার্জন বা শৌচকর্ম্মাদি করে। জল বিনা আপত্তিতে সকলের কার্যই সাধন করিয়া দেয়। সেইরূপ একই দৈবীশক্তি—পরাশক্তি উপাসকের আধার ভেদে, ক্ষেত্র ভেদে বিভিন্নরূপে ও ভাবে অৰ্চ্চিত হন এবং সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। একই সরস্বতী দেবী পাঠশালার ছোট ছোট ছাত্রদের গৃহে পূজিত হন, কলেজের বিজ্ঞ ছাত্রদের আঙ্গিনায় পূজিত হন, নৃত্য-কারের নৃত্যশালায় পূজিত হন, সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গীতশালায় অর্চিত হন। আবার ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বিগণ তাঁহাদের মন্দিরে সেই ব্রহ্ম-স্বরূপিনীর অর্চনা করিয়া আত্মস্থ হন। ইহাই হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট। ছোট বালক তাঁহাকে অর্চনা করিয়া বলে—'বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।' বিজ্ঞ যুবক যুক্ত করে বলে—'বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।' শিল্পীগণও প্রণতঃ হইয়া বলে—'বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।' আবার আত্মজ্ঞান লিপ্সু সাধকও, ধ্যানমগ্ন হইয়া বলেন—'বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।'

সা বিদ্যা পরমামুক্তে
হেঁতুভূতা সনাতনী
সংসার বন্ধহেতুশ্চ
সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।

ঋষি মেধস রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে এই বিদ্যার

পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—ইনিই মহামায়া রূপে জীবকে বদ্ধ করেন, আবার ইনিই কৈবল্যদায়িনী রূপে মানুষকে মুক্তি প্রদান করেন। যে যেমনটি চায়, মা ঠিক তেমনটি হইয়াই আসেন। সুকৃতিবানের গৃহে তিনি লক্ষ্মী আবার দুষ্কৃতিবানের ঘরে তিনিই অলক্ষ্মী। তিনি প্রসন্ন থাকিলে অভ্যুদয়কামীদের ধনজনের অভাব হয় না, তাহার পুত্র কলত্র ভৃত্য অনুগত থাকে। আবার তিনি রুষ্ট হইলে সমস্ত বাসনা কামনা বিনষ্ট হয়, ইচ্ছার অভিঘাত হয় পদে পদে।

শিশুগণ তাহাদের শিশুমন নিয়া বলে—ভাষাগত যে বিদ্যা সেই বিদ্যা আমাকে দাও, যেন পরীক্ষায় পাশ করিতে পারি। যুবকগণ আরও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া বলে—আমাকে ডাক্তার কর, ইঞ্জিনীয়ার কর, হাকিম কর, যেন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করিতে পারি ও ভবিষ্যৎ জীবনে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখী হইতে পারি। সঙ্গীত-লিপ্সু বলে—আমার কণ্ঠকে কোকিলকণ্ঠ করিয়া লও, মধুর সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিব; রেডিও গ্রামোফোনে আমার গান প্রচারিত হইবে। নৃত্যকার বলে খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় আমার চরণ-যুগল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নৃত্যরত থাকুক; সংবাদ পত্রে যেন আমার নৃত্যরত ছবি বাহির হয়। মাও হাসিয়া বলেন—'তথাস্তু'। কিন্তু সাধ মিটে না, আশার শেষ হয় না। জীবনে বহু অভাব থাকিয়া যায়। আরও যেন কি পাইতে হইবে, আরও বহুদূর অগ্রসর হইতে হইবে। যাহা পাইয়াছি তাহাই শেষ পাওয়া নহে, যেখানে পৌঁছিয়াছি তাহাই শেষ গম্যস্থল নহে। কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বী তাঁহার ধ্যান ও সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া কম্বুকণ্ঠে বলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সমস্ত অজ্ঞানতার পরপারস্থিত, সমস্ত বাসনা কামনার পরপারস্থিত, সমস্ত অভিলাষের পরপারস্থিত, আমি সেই মহান পুরুষকে জানিয়াছি। তিনি—

"জ্যোতিষামপি তৎজ্যোতি—
তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং
হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।"

জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্য বস্তুরূপে তিনিই সকল হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি সমস্ত প্রকাশেরও প্রকাশ, সমস্ত অজ্ঞানতার পরপারে অবস্থিত।

সেই তাঁহাকে, সেই ব্রহ্মময়ীকে সেই সৎচিৎ আনন্দময়ীকে, সেই শুভ্রাকে, সেই নিষ্কলাকে, সেই বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজাকে আমি আমার ধ্যানে সমাধিতে বিদিত হইয়াছি। যদিও তিনি অবিদিত হইতে পৃথক এবং বিদিতেরও পরপারে তথাপি তাঁহার মধুময় স্পর্শ পাইয়াছি—আমার হৃদয়ে, দহরে, অম্বরে। এতদিন মৃত্যু হইতে মৃত্যুর কোলেই ঢলিয়া পড়িয়াছি, নানাকে চাহিয়াছি, বহুর অভিলাষ করিয়াছি। আজ আমার ধ্যানকক্ষে সেই পরাবিদ্যাকে লাভ করিয়াছি, যাঁহাতে সমস্ত বহুত্বের অবসান ঘটিয়াছে।

ব্রহ্মা অচ্যুত ও শঙ্কর যাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন, যাঁহাকে পাইতে যাইয়া তপস্বী নচিকেতা যমকে বলিয়াছিলেন—'ন তত্র ত্বং, ন জরয়া বিভেতি।' যেখানে জরা মৃত্যু ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না আমি সেই পরাবিদ্যাকে চাই। ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বিগণ

ধ্যানমগ্ন হইয়া জরা-মৃত্যু-ব্যাধির পরপারস্থিত সেই ব্রহ্মময়ীরই তপস্যা করেন, অর্চ্চনা করেন। তাঁহারা মায়ের দান চাহেন না, শুধু মা'কেই চাহেন। মা'ও হাসিয়া বলেন 'তথাস্তু'। হে প্রিয় পুত্রগণ—তোমরা আমার ধ্যানে নিমগ্ন হইতে হইতে আবার আমার বক্ষে চিরশান্তি লাভ কর। ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা—১৩৬৯।

"আবৃত্ত চক্ষুঃ"

সাধনার মূল কথা হইল—চক্ষুকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আনন্দময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। অন্তরে যদি থাকে বিষয়ের বাসনা, ইন্দ্রিয়বর্গ যদি সাধনার ছদ্মসাজে বিষয় সুখকেই খুঁজিয়া বেড়ায় তাহা হইলে দীর্ঘকাল নিরন্তর সাধনা করিয়াও সাধক দিব্যরাজ্যে পৌঁছিতে পারে না, আনন্দময়ের সন্ধান পায় না। প্রথম নিজের প্রতি নিজের কল্যাণ ইচ্ছা জাগাইতে হইবে। বিষয়ের পর বিষয়কে ভোগ করিয়া জীবনের কল্যাণ সাধিত হয় না, শুধু হৃদয় ভারাক্রান্তই হয়, চোখের সামনে অন্ধকার ঘনায়মান হইয়া উঠে, সামনে আর পথ দেখা যায় না। পঞ্চভূতের মধ্যে, এই নামরূপময় বিশ্বের মধ্যে বারবার যাতায়াত করিতে করিতে একদিন পথিক নিজেকে পথশ্রান্ত বলিয়া অনুভব করে। আমি শ্রান্ত, আমি ক্লান্ত, আমি পথহারা পথিক। তখনই ঋষিদের কণ্ঠস্বর

সেই পথিক শুনিতে পায়—দৃষ্টিকে ফিরাও, ইন্দ্রিয়বর্গকে ফিরাও, মনকে ফিরাও। যাহা তোমার নয়, যাহা তুমি নও তাহাকে খুঁজিতে যাইয়া, পাইতে যাইয়া, ধরিতে যাইয়া বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছ। তোমার ইন্দ্রিয়বর্গ দুষ্ট ঘোড়ার ন্যায় বিপথে ছুটিয়া ছুটিয়া অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে।—

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবতি অমনস্ক সদাঽশুচিঃ,
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি।

তোমার দুষ্ট ঘোড়া সকল কলুর বলদের মতন শুধু সংসার চক্রেই ঘুরিয়াছে। পরিণামে পাইয়াছ মৃত্যু হইতে মৃত্যু, অন্ধকার হইতেও অন্ধকার, শুধু আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন। এবার চক্ষু ফিরাও, ইন্দ্রিয়বর্গকে ফিরাও, মনকে ফিরাও।

কিন্তু হায়, মন বিদগ্ধ হইয়াও ফিরিবার পথ পায় না। যে সংসার পঙ্কে একবার সে ডুবিয়াছে তথা হইতে নিষ্ক্রামণের পথ পায় না। ডাক শুনিয়া উঠিতে চায়, কিন্তু উঠিতে পারে না। অভ্যস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাদের পুরাতন পথ হইতে নূতন পথে আবার কিভাবে চলিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারে না। ডাক শুনে কিন্তু দিক নির্ণয় করিতে পারে না। চতুর্দ্দিকে যে আঁধার ঘিরিয়াছে। কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিতে চলিতে চতুর্দ্দিকে যে শুধু কণ্টকই দেখিতেছে, সংসারতাপে দগ্ধ হইতেছে, নিষ্পেষিত হইতেছে। কিন্তু উপায়ও নাই, গতিও নাই। মানুষের জীবনে ইহা এক চরম দুর্দ্দিন। সেই দুর্দ্দিনে একমাত্র উপায় হইল—'শুভেচ্ছা'। সর্ব্বতোভাবে আমি আমার শুভ বিধান করিবই। সর্ব্বতোভাবে আমি এবার কল্যাণের পথে চলিবই। বহুলোকের দেখাদেখি ঈশ্বরকে লাভ করিতে যাইয়াও বিষয়কে চাহিয়াছি—ঈশ্বরের দান চাহিয়াছি—তাঁহাকে

চাহি নাই। পুত্র চাহিয়াছি, কলত্র চাহিয়াছি, মান চাহিয়াছি। —"পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধর্থং নেষ্যামি চণ্ডিকালয়ম্।"—পুত্র আয়ু ও ধন-বৃদ্ধির জন্যই ব্রহ্মময়ীর উপাসনা করিয়াছি। যিনি অমৃত ফল দেন, যিনি মোক্ষ প্রদান করেন তাঁহার নিকটও বিষয় ফলই চাহিয়াছি। ধর্ম্ম করিতে আসিয়াও পুত্রহীন পুত্রকে চায়, ধনহীন ধনকে চায়, রূপহীন রূপ চায়। যাঁহার নিকট চায় তাঁহাকে পিছনে রাখিয়া তাঁহার বর ও আশীর্ব্বাদ লইয়া ঝাঁপ দেয় লালসার সাগরে। মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে না—

"হারায়ে আমার সকল বিত্ত
তোমাতেই যেন ভরি মা চিত্ত।"

সাহস করিয়া একথা বলিতে পারে না। দেখে সকল দিকে সকল চতুর লোকগণ তীর্থে তীর্থে দেবমন্দিরে শুধু একথাই বলিয়া বেড়ায়—পুত্র দাও, বিত্ত দাও, আয়ু দাও, যশ দাও। —"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।"—সে একা মঙ্গলের কথা কল্যাণের কথা শান্তির কথা কিরূপে বলিবে? কোটি কোটি জীব যে পথে চলিতেছে সে তাহার বিপরীত পথে কিরূপে চলিবে? কিন্তু তাহার অন্তরের বৈরাগী মন বার বার বিমুখ হইয়া বলে—আর চর্বিত চর্বণ করিব না, যাহা ভোগ করিয়া বহুজন্ম বিদগ্ধ হইয়াছি, যাহা পাইয়া বহু বার প্রবঞ্চিত হইয়াছি তাহার পিছনে আর ছুটিব না।

"আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন,
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্।"

সেই বৈরাগী মন ইন্দ্রিয়বর্গকে সঙ্গে লইয়া আবার নূতন পথে যাত্রা করে। কিন্তু এপথ যে সহজ নহে। বহুদূরে সে আসিয়া পড়িয়াছে। এই দূর হ'তে দেখা যায় ক্ষীণ দৃষ্টিতে

একটি পথ। ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ, অতি দুর্গম এই পথ। যেখানে সে রহিয়াছে, যেখানে সে বাসা বাঁধিয়াছে তাহাতে যতুগৃহের ন্যায় দগ্ধ হইতেছে। আবার যে পথে সে যাত্রা করিবে সে পথও—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতদুরত্যয়া,
দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

—কবিগণ, দর্শিগণ, ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারের ন্যায় এপথ অতি সূক্ষ্ম, এপথ অতি দুর্গম। মনকে ফিরাইয়াছ? কিন্তু এপথে কিরূপে চলিবে?—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।" —উঠ, জাগ, আত্মজ্ঞদের সমীপে চল।

আত্মকৃপা, শাস্ত্রকৃপা, গুরুকৃপা। প্রথম নিজের প্রতি নিজে কৃপা কর। উঠ, জাগ, তবেত আত্মজ্ঞ গুরুকে লাভ করিবে। —"আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুঃ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।" এতদিন নিজে নিজের শত্রু হইয়াছ, সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের সাহায্যে নিজের স্কন্ধে বোঝা তুলিয়া ভারাক্রান্ত হইয়াছ। এবার—'ফেলে দিয়ে দায়ের বোঝা সোজা হয়ে দাঁড়া নারে।'—দায়ের বোঝা ফেলে দাও। এতদিনের সঞ্চিত, এতদিনের আহৃত সাধের উপকরণগুলি নিক্ষেপ কর। এই আত্মকৃপা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। নিজে নিজের মিত্র হও। নিজেকে নিজে কৃপা কর। 'হৃদয় গলিবে না, চরণ টলিবে না কাহারও করুণ ক্রন্দনে।' —সঙ্কল্পে দৃঢ় হও। তুমি একলা চল, একলা চল, একলা চল। দুর্গম পথ যাহা ভাবিতেছ তাহা দুর্গম নহে, তীক্ষ্ণপথ যাহাকে ভাবিয়াছ তাহা তীক্ষ্ণ নহে। দূর হইতে ঐ পথ দুর্গম মনে হয়, দূর হইতে প্রশস্ত রাজপথকে সূক্ষ্ম রেখাবৎ দেখায়। চক্ষু আবৃত্ত করিয়া এই পথে একটু

অগ্রসর হও। দেখিবে পথে পথে দক্ষিণে ও বামে ঋষিদের ধ্বজা ও পতাকা রহিয়াছে। শাস্ত্রবাক্য পদে পদে তোমাকে পথের নির্দ্দেশ দিবে। ঋষিদের পদচিহ্ন আলোক বৰ্ত্তিকা হইয়া তোমাকে পথ দেখাইবে। ইহাই শাস্ত্রকৃপা। অকৃত্রিম হইয়াছে যাহাদের অন্তর, সংকল্প হইয়াছে যাহাদের সুদৃঢ়, বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়াছে যাহাদের মন, ইন্দ্রিয় অশ্ববর্গ হইয়াছে যাহাদের সৎ, বুদ্ধি হইয়াছে যাহাদের সারথি তাহাকে শাস্ত্রবাক্য পদে পদে কৃপা করে। ঋষি পদচিহ্নের আলপনা গম্যস্থল দেখাইয়া দেয়। শাস্ত্রবাক্য ভিন্ন ভিন্ন নহে, ঋষিদের কথা ভেদমূলক নহে।

আত্মকৃপা ও শাস্ত্রকৃপা লাভ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। তিনি যে মূর্ত্তশাস্ত্র, তিনি যে জঙ্গম তীর্থ, তিনি পতিতপাবনী সুরধুনী, তিনি স্বর্গের মন্দাকিনী। সেই ঋষি প্রদর্শিত পথের দু'কূলে ঐ মন্দাকিনী প্রবাহিত হয়। পান করিয়া পিপাসা মিটে, স্নান করিয়া তাপিত অঙ্গ শীতল হয়। সেই জঙ্গম তীর্থের ছায়াতলে বসিয়া পথশ্রান্তি দূর হয়। ইহা জীবনের এক শুভ দিন।

তাই বলি—যে সাধক আত্মকৃপা লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে শাস্ত্রকৃপা লাভ করা কঠিন নহে। আবার যে সাধক আত্মকৃপা ও শাস্ত্রকৃপা লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপালাভ করা আর কঠিন নহে। সেই পথিক পথকে আর তখন দুর্গম বলে না। সেই পথিক তাহার দিব্যকর্ণে শুনিতে পায়—'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। তুমি বিষয়ের দাস নহ, তুমি পাপদগ্ধ তাপদগ্ধ জীব নহ, তুমি অমৃতের পুত্র। ঐ দেখ তাঁহার দিব্যরাজ্যের ধ্বজা দেখা যায়। ঐ শুন তাঁহার

রাজ্যের সুমধুর অনাহত ধ্বনি শুনা যায়। এই ত' ক্ষণে ক্ষণে তাহার দিব্য অঙ্গজ্যোতি আসিয়া তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছে। ভয় কি শিশু! তুমি ত' এখানে একা নহ। যেখানে জন্ম জন্মান্তর পড়িয়াছিলে তথায় বহুর মধ্যে থাকিয়াও তুমি একা ছিলে, বহুর মধ্যে থাকিয়াও তুমি মৃত্যুর কবলেই ছিলে, আজ তুমি একা নহ। আজ তুমি আশ্রয়হীন নহ। দৃষ্টি ফিরাইয়াছ, ইন্দ্রিয়বর্গকে ঘুরাইয়াছ, বুদ্ধিকে সারথি করিয়াছ, চল এইবার পথে চল।

অন্ধকার জগৎকে ঢাকে না, ঢাকে চোখের দৃষ্টিকে। জগৎ আলোতে যেমন ছিল অন্ধকারেও ঠিক তেমনই থাকে। চোখই জগতের রূপগুলি দেখিতে পায় না মাত্র। সেইরূপ মায়া আত্মাকে ঢাকে না, ঢাকিতে পারে না; ঢাকে শুধু মনকে, ঢাকে অন্তরের দিব্যদৃষ্টিকে। সেই দিব্যদৃষ্টি লাভ কর, অমৃত হইবে, অমর হইবে, অভয় হইবে। ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা—১৩৬৯।

বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার অত্তা মূর্তি

বেদান্ত দর্শন বলিয়াছেন—অত্তা চরাচর গ্রহণাৎ, ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা অর্থাৎ মা এই চরাচরকে ভক্ষণ করেন বলিয়া তিনি অত্তা। প্রথমে বেদান্তকার বলিয়াছেন যাহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি এই বিশ্ব প্রতিপালন করিতেছেন এবং যাহাতে বিশ্বের অনন্তরূপের পরিসমাপ্তি ঘটে তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই মা। উৎপত্তি মনের ধর্ম, সেই মনের অধিপতি হইলেন ব্রহ্মা। স্থিতি ভোগ বা প্রতিপালন প্রাণের ধর্ম, সেই প্রাণের অধিপতি বিষ্ণু। লয় বা পরিসমাপ্তি জ্ঞানের ধর্ম (জ্ঞানে সর্বং পরিসমাপ্যতে), এই জ্ঞানের অধিপতি হইলেন শিব। তাই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের সম্মিলিত শক্তিকে বেদান্তকার একস্থানে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (জন্মাদ্যস্য যতঃ)। আবার এই ব্রহ্মেরই শিব মূর্ত্তিকে অর্থাৎ জ্ঞানময় মূর্ত্তিকে অত্তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মৃত্যুতে জীবের আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের পরিসমাপ্তি ঘটে না—'ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ', যাহার মৃত্যু হইবে তাহার আবার জন্ম হইবে। তাই মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে না, কিন্তু জীবনের এই দীর্ঘপথের পরিসমাপ্তি একদিন ঘটে। সেই পরিসমাপ্তির পরে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। 'যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে', এই আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্থিতির চিরতরে যেখানে পরিসমাপ্তি ঘটে, তাহাই ব্রহ্মের অত্তা স্বরূপ। তাহাই জ্ঞানময় শিবের বিশুদ্ধ অবস্থা। "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্

ইহ বিদ্যতে” “সর্ব্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” সমস্ত ইন্ধনের যেখানে অবসান হয়, ভয়লেশও যেখানে থাকে না, তাহাই জীবনের পূর্ণ পরিণতি অবস্থা, তাহাই চরম বাঞ্ছিত অবস্থা। এই শেষ পরিণামের কথা বলিতে যাইয়াই বেদান্ত-কার ব্রহ্মকে বলিয়াছেন—‘অত্তা’। এই চরাচর বিশ্বের সকল বস্তু ও জীব ক্রম বিকাশের পথে অথবা আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের পথে এই অত্তার পবিত্র গ্রাসে নিজের ব্যষ্টিত্বকে হারাইয়া সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লাভ করে।

তোমরা মা অন্নপূর্ণার নিকটে ঐ যে শিবকে দেখিতেছ—তিনিই অত্তা। একদিকে তিনি অনন্তরূপে রূপায়িত হইয়া অন্নপূর্ণা সাজিয়াছেন, অন্যদিকে তিনি সেই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিকে গ্রাস করিবার জন্য অত্তারূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইতে দেখাইতে বলিয়াছিলেন—এই বিশ্বরূপে আমিই রূপায়িত, আবার বলিয়াছিলেন—

“কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুম ইহ প্রবৃত্তঃ। গীতা।

অনন্তরূপে রূপায়িত হওয়ার অনন্তশক্তি যেমন তাঁহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তেমনি অনন্তশক্তিকে গ্রাস করিবার দিব্য-শক্তিও তাঁহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে একাদশ অধ্যায়ে যে রূপ দেখাইয়াছিলেন, তন্ত্রে এই অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিগণ সেই দিব্যরূপই দেখিয়া-ছিলেন। যিনি শক্তি তিনিই শক্তিমান, যিনি অনন্ত তিনিই শান্ত, একাধারে যিনি বহু তিনিই আবার এক।

আচার্য শঙ্কর অন্নপূর্ণার স্তবগান গাহিতে যাইয়া বলিয়া-ছিলেন—‘ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী’। আবার বলিয়াছিলেন—‘লীলা

নাটক সূত্র ভেদনকরী বিজ্ঞান দীপাঙ্কুরী' যাহার উদরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে দেখিয়াছিলেন আবার তাঁহার মধ্যেই দেখিয়াছিলেন —পরবৈরাগ্যরূপ বিজ্ঞান স্বরূপ। অনন্তরূপে যিনি রূপায়িত হইয়াছেন তিনিই আবার বিজ্ঞান বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া অনন্তের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ শিব ও অন্নপূর্ণাকে তাহাদের ন্যায়ই স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ বিশিষ্ট দেবতা মনে করে। শুধু পার্থক্য সাধারণ মানুষ জীব, আর ইঁহারা হইলেন দেবতা। দেবতা হইলেও ইঁহাদের কাম কাঞ্চনের লালসা ও সুখ দুঃখ বোধ সবই আছে, এমন কি তাহারা পার্বতীর গর্ভে শিবের ঔরসে কার্ত্তিক ও গণেশের জন্ম হইয়াছে বলিয়া বেশ পাকা সাংসারিক সম্বন্ধ হর পার্ব্বতীর মধ্যে স্থাপন করে। ক্ষণে শিবকে ভিখারী সাজাইয়াছে, ক্ষণে শ্মশানবাসী করিয়াছে, ক্ষণে পরম যোগী বলিয়াছে। ক্ষণে ভোলানাথ বলিয়া শক্তির পদতলে তাঁহাকে শয়ন করাইয়াছে। ক্ষণে শিবপত্নী সতীর দেহত্যাগের বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত ভৈরব সাজাইয়াছে। কবির কল্পনা অদ্ভুত—যাঁহার ঘরনী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা তিনিই আবার অন্নের ভিখারী। তাই সাধারণ মানুষ অন্নপূর্ণা পূজা করে অন্ন লাভের প্রত্যাশায়। বহু অন্ন হইবে, সুখে সংসারে থাকিবে ইহা ভাবিয়াই তাহারা অন্নপূর্ণা পূজা করে। শিবের অর্চ্চনা তাহাদের কাছে বিশেষ কিছুই হয় না। তিনি উপেক্ষিত হইয়া অন্নপূর্ণার পাশে দাঁড়াইয়া থাকেন মাত্র। অন্নপূর্ণা রাজরাজেশ্বরী বেশে সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইয়া ঐরূপ ভক্তদের পূজা গ্রহণ করেন। তাহারা প্রার্থনা করে—বুভুক্ষানলতপ্তানাং

পুত্রানাং হর দুর্গতিং। বুভুক্ষা বলিতে তাহাদের দৃষ্টি থাকে জঠরাগ্নির প্রতি। মনের ক্ষুধা, প্রাণের ক্ষুধা বা জ্ঞানের ক্ষুধার কথা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে থাকে না। উপনিষদে ঋষি দেখিয়াছিলেন এই অন্নপূর্ণাকে—পঞ্চকোষেরই অন্নপ্রদায়িনী রূপে, শুধু জঠরাগ্নির নিবৃত্তি তিনি করেন না, তিনি মন প্রাণ ও জ্ঞানের বুভুক্ষাও নিবারণ করেন। তাই ঋষি গাহিয়াছিলেন—

এতমন্নময় আত্মানমুপসংক্রম্য
এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য
এতং মনময়মাত্মানমুপসংক্রম্য
এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য
এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য

ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁহারা শুধু শিবকে ভিখারী রূপেই দেখেন নাই। অন্নপূর্ণাকে শুধু স্থূল অন্নপ্রদায়িনী রূপেই দেখেন নাই। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন—একই ব্রহ্মের দুটি ভঙ্গিমা—তিনি যেমন অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে পঞ্চকোষের অন্নবিধান করেন, তেমনি আবার অত্তা মূর্ত্তিতে সমস্ত অন্নকে গ্রাস করেন। তাঁহারা অন্নপূর্ণাকে দেখিয়াছিলেন অন্নমূর্ত্তিতে এবং শিবকে দেখিয়াছিলেন অত্তা মূর্ত্তিতে, তাই আত্মস্থ ঋষি গাহিয়াছিলেন—

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্
অহমন্নাদো অহমন্নাদো অহমন্নাদঃ।

আমিই অন্ন আমিই অন্ন আমিই অন্ন, আবার আমিই অন্ন ভোক্তা আমিই অন্ন ভোক্তা আমিই অন্ন ভোক্তা, আমিই অন্ন ও অন্ন ভোক্তার মিলন ঘটক। আমি মূর্ত্তামূর্ত্ত জগতের ও দেবগণের পূর্ববর্ত্তী। আমাতে অমৃতত্ব প্রতিষ্ঠিত। আমিই

পরম স্বরূপে সমস্ত জগতকে শাসন করি।

ঋষি তাঁহার দিব্য অনুভূতিতে অন্নরূপী অন্নপূর্ণা ও অত্তা-রূপী শিবের ভেদ ও অভেদ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শিবকে ভিখারী রূপে না দেখিয়া অত্তামূর্ত্তিতে দর্শন করিয়াছিলেন আর অন্নপূর্ণাকে স্ত্রী বেশধারী এক নারী মূর্ত্তিতে না দেখিয়া পঞ্চ কোষেরই অন্ন বা অন্নদাত্রীরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। আরও দর্শন করিয়াছিলেন যিনি অন্নদাত্রী তিনিই অন্নভোক্তা। তাই ঋষি পুনঃ পুনঃ উদাত্তকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।
স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা।
ইদং সর্বং অসৃজৎ।
যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা।
তদেবানুপ্রাবিশৎ।

পরমাত্মা অভিলাষ করিলেন—আমি বহুরূপে লীলায়িত হইব। তিনি বহু হইলেন এবং সেই বহুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ইহাই ব্রহ্মতত্ত্ব, ইহাই ব্রহ্ম বিজ্ঞান।

শুধু অন্নবস্ত্রের অভাবে হাহাকার করিয়া যাহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া ঘুরিতেছ তাহারা এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বুঝিবার অধিকারী নহ। তাহারা পূর্ব্বে যেমন শিবকে ভিখারী সাজাইয়া এবং অন্নপূর্ণাকে শুধু স্থূল অন্নদায়িনী মূর্ত্তিতে দেখিয়া অর্চনা করিয়াছে আজও তাহা করিবে। কিন্তু মনে রাখিও এ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবে না। এই অন্নময় কোষকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। তত্ত্বের গভীর গহন সাগরে অবগাহন করিতে হইবে। তপস্যা প্রভাবে মনময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষকে

অতিক্রম করিয়া শিবের অন্তর্মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিতে হইবে। শিব ও শিবানী অন্নপূর্ণা ও ভোক্তা একেরই লীলা বিলাস মাত্র ইহা জানিয়া দেখিয়া প্রবেশ করিয়া পরম জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্'

ভেদময় দ্বৈতপ্রতীতি লইয়া যাহারা দেবতার অর্চ্চনা করে তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হয়। দেবান দেবযজো যান্তি, কিন্তু তত্ত্বত এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া যাহারা এই অনন্ত ভেদের মধ্যেও অভেদের সন্ধান পায় তাহারাই আরও গভীর তপস্যা প্রভাবে ব্রহ্মবিদ, বরীয়ান ও বরিষ্ঠ হয়। ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ব্রহ্ম সারূপ্যে প্রবেশ করে।

তোমরা আজ এই পূজাক্ষেত্রে কি অভিলাষ লইয়া আসিয়াছ তাহা তোমরাই জান। যদি ধন জন তথা অভ্যুদয়ের অভিলাষ লইয়া বৈশ্য ও শূদ্রের ন্যায় মায়ের অর্চনা করিতে আসিয়া থাক তবে আজ দৃপ্তকণ্ঠে বলিব তোমরা এখনও তৃতীয় স্তরের সাধক। এতদিন গভীর তত্ত্বকথা শুনিয়াও গভীর ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পার নাই। তাইত' ঋষিগণ বলিয়াছেন—ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং— ধর্ম্মের তত্ত্ব গভীর গুহায় সঞ্চিত আছে। স্থূলবুদ্ধি নিয়া জড়ত্ববাদী তোমাদের তথায় প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তোমরা দেবতার অর্চনা করিয়া এই ভৌতিক জগতে এই মনুষ্যলোকে ধনী ও মানী হইতে পারিবে কিন্তু জীবত্বের জ্বালা জুড়াইতে পারিবে না—"ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা" যদি দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি চাহ— যদি যথার্থই শান্তির অভিলাষী হইয়া থাক তাহা হইলে ব্রহ্মতত্ত্বে অবগাহন করিতেই হইবে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—

শৈবই হও আর শাক্তই হও, বৈষ্ণবই হও আর গাণপত্যই হও, যে দেশের যে ধর্ম্মের সাধকই তুমি হওনা কেন, এই ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে হইবে অর্থাৎ তোমার ইষ্টকে, আরাধ্যকে ব্রহ্মের বিকাশরূপে দেখিয়া এবং এই বিশ্বচরাচরে সেই বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া তবে মুক্তির পথ পাইবে। আজ এই অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মধ্যে যদি অভেদ ব্রহ্মতত্ত্ব ফুটাইতে পার তবেই তোমার পূজা সার্থক হইবে। তোমার বিজাতীয় ও স্বজাতীয় ভেদ ঘুচাইয়া স্বগত ভেদে প্রবেশ করিতে পারিবে। সেই বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষকে অতিক্রম করিয়া তবেত' শুদ্ধ ও নিষ্কল হইতে পারিবে।

অন্নপূর্ণাকে শুধু অন্নরূপেই দেখিও না। তিনি একাধারে অন্ন ও অন্নের ভোক্তা। তোমার ভিতরে প্রাণরূপে যিনি ভোক্তা, জীবচেতনারূপে যিনি ভোক্তা—তিনিই বাহিরে স্থূল অন্নমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন।

'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামং ইমং কৃৎস্নং অবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥'

তোমার জীবচেতনাকে অর্থাৎ তোমার প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তিনি যেমন জীব সাজেন—তেমনি জীবের ভোগ্যবস্তু রূপেও বহুরূপ ধারণ করেন। বাহিরে এই বিশ্বে তিনি যেমন অন্ন জল বায়ু প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন তেমনি তোমার মনোময় জগতে, তোমার চিত্তাকাশে তিনি সুখ দুঃখ, রোগ শোক, কাম ক্রোধ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া তোমার মনোময় কোষকে ক্ষণে পুষ্ট ও ক্ষণে শুষ্ক করিতেছেন। তুমি তাই কখনও হাসিতেছ কখনও কাঁদিতেছ। আবার তোমার বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে অধিকৃতের অবসান রূপে অর্থাৎ

নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপে তিনিই অবস্থান করিয়া শ্রেয় ও প্রেয় পথের পতাকা উড়াইতেছেন। সেই বিজ্ঞানময় কোষকে অতিক্রম করিলে তুমি স্বগতভেদময় এক অপূর্ব্ব ব্রহ্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবে। আনন্দে ভরিয়া উঠিবে তোমার সমস্ত কোষ। তখনই তুমি ঋষিদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে পারিবে তিনি দূরে ও নিকটে, তিনি অন্তরে ও বাহিরে। এই অন্তর ও বাহিরের যে ক্ষীণ ভেদটুকু থাকে তাহাও গ্রাস করে এই 'অত্তা'—এই বিজ্ঞানময় মহেশ্বর। তোমরা অন্নপূর্ণার পূজা করিয়াছ কিন্তু বিজ্ঞানময় মহেশ্বরকে ভিখারী ভাবিয়া উপেক্ষাই করিয়াছ। এবার তোমার জীবকোষ হইতে আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া আরও উজ্জ্বল ও দিব্যচক্ষু লইয়া একবার বিজ্ঞানময় মহেশ্বরের অত্তা মূর্ত্তিকে দেখ। দেখিবে যে মা সাজিয়াছেন অন্নপূর্ণা, যে মা সাজিয়াছেন এতদিন তোমার জীববোধরূপে এ অনন্ত রূপ ও গুণরূপে তিনিই আবার অত্তা মূর্ত্তিতে তোমাকে গ্রাস করিয়া কৈবল্য ধামের সন্ধান দিতেছেন। যিনি শিব তিনিই শিবতর, যিনি মঙ্গলময় তিনিই মঙ্গলতর। যিনি সুখময় ও লীলাময় তিনিই শান্তিময় তিনিই একং নিত্যং বিমলং অচলং—তিনিই সত্য—তিনিই জ্ঞান—তিনিই আনন্দ।

আজ এই অত্তারূপী মহেশ্বরকে দেখ—তাঁহার নিকট তোমার জীবরূপী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিকে নিবেদন করিয়া দাও—তোমার কোষে কোষে পঞ্চকোষে এই অত্তাকে অধিষ্ঠিত হইতে দাও—তুমিও শিব হইবে, শিবতর হইবে। যথার্থ মঙ্গলের এবং শান্তির সন্ধান পাইবে। তোমার দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবে। তখনই প্রণত হইয়া বলিতে পারিবে—বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং

নিখিল ভয় হরং ওঁ শিবায় নমঃ। আবার বলিতে পারিবে—

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ।
ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা—১৩৬৯।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি

"গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

গুরুই পরম ব্রহ্ম। যিনি গুরু তিনিই ব্রহ্ম। তাই সাধকগণ বলেন—গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিতে নাই। তবে কি মনুষ্য দেহধারী গুরুই ব্রহ্ম হইলেন? দেহধারী গুরুই যদি ব্রহ্ম হন তবে তাঁহাকে দেখিলেই ত' ব্রহ্মদর্শন হইল; তাঁহাকে পাইলেই ত' ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইল! অতএব সাধনা ও তপস্যার প্রয়োজন কি? এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই অনেকের মনে উদয় হয়। শাস্ত্র বলে—যিনি ব্রহ্মবিদ্ তিনি ব্রহ্মতুল্যই। যীশু বলিয়াছেন—'I and my father are the same'—আমি এবং আমার পিতা একজনই। হিন্দু তপস্বিগণ বেদের চারটি মহাবাক্য হইতে এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন—জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। "অহং ব্রহ্মাস্মি।" জীব যদি ব্রহ্ম হন এবং দেহধারী গুরুই যদি ব্রহ্ম হন, তবে ব্রহ্ম লাভের জন্য প্রচেষ্টা বা তপস্যার কি প্রয়োজন? দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সাধকগণ বলিয়া থাকেন—'জীব কভু নাহি হয় ঈশ্বর সমান।' জীব ঈশ্বরের সমতুল্য হইতে

পারেনা। জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। আবার কোন কোন বৈষ্ণবশাস্ত্র একথাও বলে—জীব এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ভেদ ও অভেদ দুই-ই আছে। দই দুধ হইতেই উৎপন্ন হয় কিন্তু দৈকে আর কখনও দুধে রূপান্তরিত করা চলেনা। জীবের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতেই কিন্তু জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। অনন্ত গুণময় ব্রহ্মের অংশ হইল জীব। যখন এই অংশাংশি ভাবের অনুভূতি লাভ করে তখনই সে সকল পাশ হইতে বিমুক্ত হয়।

ভক্তিবাদীই হউন আর জ্ঞানবাদীই হউন গুরুবাদ কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন। যাহারা ব্রহ্মবিদ্ গুরুকে ব্রহ্ম বলিয়া দেখেন তাহারা যেমন গুরুকে স্বীকার করেন, তেমনি যাহারা জীবকে ভগবানের নিত্যদাস বা তাঁহার অংশ বলিয়া স্বীকার করেন তাহারাও গুরুবাদকে স্বীকার করেন এবং প্রণত হইয়া বলেন—'গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।'

গুরুগীতায় গুরুকে দেখিবার তিনটি ভঙ্গিমার নির্দ্দেশ আছে। এক হইল—যিনি সেই পরমপদকে দর্শন করাইয়া দেন তিনিই গুরু। এখানে পরমপদ হইতে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে গুরু ভিন্ন। গুরু পথ প্রদর্শক, প্রেরণাদাতা। ব্রহ্ম জীবনের লক্ষ্য। দ্বিতীয় স্তরে সাধকগণ অনুভব করেন—গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু আবার গুরুই মহেশ্বর। গুরু শুধু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরই নহেন তিনি পরমব্রহ্ম। দেহধারী গুরুর সঙ্গে এই পরমব্রহ্ম তত্ত্বের কি সম্বন্ধ আছে ইহা ভাবিবার ও অনুভব করিবার বিষয়।

প্রথম স্তরে গুরু পথ প্রদর্শক; শিষ্য পথের যাত্রী; লক্ষ্য-স্থল ব্রহ্ম। ইহা খুব গভীর গহন তত্ত্ব নহে। মানুষ সহজেই

ইহা বুঝিতে পারে। কিন্তু গুরুগীতা যেই নির্দ্দেশ দিল গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর, তখনই অনুভূতিবিহীন সাধক যুক্তি ও তর্কের দ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া ইহার সুসঙ্গত উত্তর পায়না। কিন্তু এখানেই যে গুরুগীতার শেষ কথা নয়। গুরুগীতা আরও বলিয়াছে—তিনি (গুরু) 'ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং';—তিনি ভাবের অতীত, তিনি গুণের অতীত। তিনি এক, তিনি নিত্য, তিনি সাক্ষী, তিনি গগনের (আকাশের) ন্যায় ব্যাপক ও নির্ম্মল। দেহধারী গুরু গগনসদৃশ কিরূপে হইবেন? যাঁহার হাড়-মাংস-বিশিষ্ট শরীর রহিয়াছে, যাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রহিয়াছে, যিনি দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছন্ন, যিনি জন্মান ও মরেন, যাঁহার বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে, তিনি গগনসদৃশ কিরূপে হইবেন? এক ও নিত্যই বা কিরূপে হইবেন? অচল ও সাক্ষী স্বরূপই বা কিরূপে হইবেন? গুরু সম্বন্ধে ইহা এক গভীর ও গহন তত্ত্ব।

যাহারা অনুভব করিতে পারে না তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন হইলেও যুক্তি ও তর্কের দ্বারা যাহারা বুঝিতে চাহে তাহাদিগকে যতটুকু সম্ভব বুঝাইবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হয়। অজ্ঞ ও অল্পবুদ্ধি সম্পন্নদের জন্যই শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞদের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। তবে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বুঝাইলেও বুঝিতে পারে না। বিচার দ্বারাই মনের জঞ্জাল পরিষ্কার হয়। মন ক্ষীণ হয়। মন ক্ষীণ হইলে হয় সত্তার অনুভূতি। অন্তরে শুভ ইচ্ছা আসিলেই সেই বিষয় জানিবার জন্য ভিতর ও বাহিরে বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে বাধা দিলে মনের সংশয় ঘুচে না।

১৩

প্রথম যুক্তি ও বিচার দ্বারা বস্তুর তটস্থ লক্ষণ বুঝিতে পারিলে অনুভূতির দ্বারা স্বরূপ লক্ষণকে বুঝিতে পারে। যুক্তি তটস্থ লক্ষণকে বুঝাইয়া দেয়। অনুভূতির দ্বারা স্বরূপ লক্ষণকে জানা যায়। অতএব আমরা যুক্তির দ্বারা গুরুর সঙ্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তথা গুরুর সঙ্গে ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ তাহাই প্রথম বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সাধক তাহার স্থূল দৃষ্টিতে প্রথম মনুষ্য দেহধারী যে গুরুকে দেখিতে পায় সেই মনুষ্য দেহধারী গুরু তাহা অপেক্ষা বিজ্ঞ, গুণবান, বিশুদ্ধ চরিত্রবান, ত্যাগী ও সংযত ইত্যাদি নানাবিধ গুণের আকর। তাই তিনি মানুষ হইলেও, সাধক তাহাকে শ্রদ্ধা করেন। এই মনুষ্য দেহধারী গুরুকে শিষ্য ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন না। তিনি ব্রহ্মকে দেখাইয়া দিবেন—যে ব্রহ্ম চরাচর পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সকল শিষ্য ব্রহ্ম কি তাহাও জানিতে চাহে না। শুধু গুরু প্রদত্ত একটা মন্ত্র চাহে। সেই মন্ত্রের কি অর্থ, কি রহস্য তাহাও জানিতে চাহে না। আবার যাহারা জানিতে চাহে তাহারা গুরু প্রদত্ত মন্ত্রের লক্ষ্যবস্তু দেবতাকে জানিয়াই সন্তুষ্ট হয়। ব্রহ্মকে জানার প্রয়োজন বোধ করে না। অর্থাৎ অখণ্ড মণ্ডলাকার যে ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার জন্য গুরুকে বরণ করে সেই ব্রহ্ম তত্ত্বই অধিকাংশ শিষ্য জানিতে চাহে না। জ্ঞানের অঞ্জন পরাইয়া তাহাকে দিব্যচক্ষু দান করিতেও প্রার্থনা জানায় না। জানিতে চাহে দেবতার নামে একটি মন্ত্র, যথা—কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, সূর্য্য, গণেশ ইত্যাদি। তাই কেহ কালী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, কেহ কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, কেহ বা শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়, আবার কেহ গণেশ জগদ্ধাত্রী বিষ্ণু ও সূর্য্য মন্ত্রে দীক্ষিত

হয় ইত্যাদি। তাহারা বলে আমরা শৈব, আমরা শাক্ত, আমরা সৌর, আমরা বৈষ্ণব আমরা গাণপত্য ইত্যাদি। কিন্তু বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও গাণপত্য হওয়াই যে গুরুবাদের মূল লক্ষ্য নহে ইহাও তাহারা জানে না, কারণ তাহারা মুমুক্ষু নহে। তাহারা স্ব স্ব দেবতার উপাসনা করিয়া ইহলোকে আরও সুখে ও শান্তিতে থাকিতে চাহে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গাদি লোকে যাইতে চাহে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা।

যদি ইহলোকে শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্মে সিদ্ধি চাহ তাহা হইলে দেবতার উপাসনা কর। কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়াছেন—"যান্তি দেবব্রতা দেবান্"—যাহারা দেবতার উপাসনা করে তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হয়। আমাকে, ব্রহ্মকে, পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু গুরুবাদের মূল লক্ষ্য হইল পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া, মুক্তিলাভ করা। ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া যাহারা দেবতার উপাসনা করে তাহারা অবিধিপূর্ব্বক অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মেরই উপাসনা করে। বহুজন্ম এই অবিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া অর্থাৎ দেবদেবীর উপাসনা করিয়া তাঁহারা—'বাসুদেব সর্ব্বমিতি ; অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ; অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেব চ'—এইরূপ তত্ত্বময় ভূমিতে আরূঢ় হওয়ার অধিকারী হন। তখন তাঁহার অন্তরে জাগে মুক্তির বাসনা। গভীরভাবে অন্বেষণ করেন ব্রহ্মের—আত্মার ; সেই সচ্চিদানন্দের পরমপুরুষের।

দেবতার উপাসনা যাহারা করে তাহাদের অনেকেই দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে, এমন কি স্বীয় আত্মার সত্তা সম্বন্ধেও

বিশেষ কিছু জানে না। কিন্তু সাধককে যে ব্যক্ত অব্যক্ত ও জ্ঞকে জানিতে হইবে। তত্ত্বত তাঁহাকে জানিয়া সেই তত্ত্বে অনুপ্রবেশ করিতে হইবে। তত্ত্বত তাঁহাকে জানিলে দেখিতে পায়—সমস্ত দেবদেবী ও বিশ্ব এমন কি চরাচর তাঁহাতেই অবস্থিত। তখনই বলিতে পারে—"ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।" যিনি চরাচর পরিব্যাপ্ত তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। গুরু কৃপায় আমার দিব্যচক্ষু লাভ হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যাহারা দেবদেবীর মন্ত্রে প্রথম দীক্ষিত হয় তাহারা ইহলোকে কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে কিন্তু সহজে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। অবিধিপূর্ব্বক অজ্ঞাতসারে তাহারা দেবদেবীকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিলেও দিব্য দৃষ্টি বহু জন্ম তপস্যার পর লাভ করিতে পারে। দেবতার উপাসনা করিতে করিতে তাহাদের জগতের বহু আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। জগৎ ভোগের স্পৃহা নিবৃত্ত হইলে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই জগতেই সুখে থাকিব এইরূপ সাধকের সংখ্যাই বহু বহু। এইরূপ সাধকদের গুরুও বহু বহু। সে সকল গুরুগণ ব্রহ্মতত্ত্ব অনেকে জানেন না, এই গুরুগণ মুমুক্ষুও নহেন। অন্ধ যেমন অন্ধকে নিয়া যায় তাহারাও সেইরূপ নিজেরা অজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞ শিষ্যকে পথ দেখাইতে প্রয়াসী হয়। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে মুষ্টিমেয় কেহ কেহ আমাকে তত্ত্বত জানে। অন্যান্য বহু গতানুগতিক স্রোতে পড়িয়া ধর্ম্ম করে। এক অজ্ঞ অন্য অজ্ঞকে পথ দেখাইবে ইহা গুরুগীতার মূল কথা নহে। তাই গুরুগীতার প্রথমেই ঋষি বলিয়াছেন—"চক্ষুরুন্মীলিতং যেন"—যিনি দিব্যচক্ষু দান করেন। জ্ঞানের অঞ্জন পরাইয়া যিনি ভিতরের চক্ষুর

অন্ধকার দূরীভূত করেন, দিব্যদৃষ্টি দান করেন, তিনিই গুরু। তারপর বলিতে আরম্ভ করিলেন—শুধু চক্ষু খুলিয়াই গুরু নিবৃত্ত থাকেন না, তিনি সেই অখণ্ডমণ্ডলাকারকে—যে অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। অহো কত ভাগ্যবান সেই শিষ্য, অহো কত ধীমান সেই গুরু। ভাগ্যবান মুমুক্ষু শিষ্য জগৎ ভোগে নিবৃত্ত হইয়াছেন। বান্ত ও পুরীষের ন্যায় জগতের ভোগ্যকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কামিনী কাঞ্চনে তাঁহার আর আসক্তি নাই। যশলিপ্সু নহেন।

"কাঞ্চন কি কাম কিংবা যশআশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ।"

অহো কত ভাগ্যবান সেই শিষ্য যে বৈরাগ্যের এই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে। অহো কত ভাগ্যবান সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু যাঁহার কাছে সমিধপাণি হইয়া আসিয়াছে বৈরাগ্যবান ব্রহ্মনিষ্ঠ শিষ্য। আশা করি তোমাদের মধ্যেও কেহ কেহ সেইরূপ বৈরাগ্যবান রহিয়াছ। একবার আত্মবিশ্লেষণ করিয়া নিজের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখ তবেই নিজেকে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু সে অন্য কথা।

আমি বলিতেছিলাম—দেহধারী গুরু কিরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হন অথবা দেহধারী গুরুর সঙ্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ও পরব্রহ্মের কি সম্বন্ধ। এ তত্ত্ব মুমুক্ষু সাধকগণই সম্যক বুঝিবার অধিকারী। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ গুরু বিরল। মুমুক্ষু সাধকও বিরল।

"আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা,
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।'

ইহার বক্তা দুর্লভ, ইহার লব্ধা নিপুণ।

আরও আশ্চর্য্য হইল—'শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ।' —এ তত্ত্ব শুনিলেও বুঝিতে পারে না। হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাই তত্ত্বকথা চিরদিনই ব্রহ্মজ্ঞদের হৃদয় গুহায়ই নিহিত রহিয়াছে।

তবু আজ সেই গহন তত্ত্ব বলিতেছি, শোন। সেই গুহায় নিহিত অতি গভীর গহন তত্ত্ব কথাই বলিতেছি। মুমুক্ষু সাধক তুমি শোন। বৈরাগ্যবান সাধক তুমি শোন; ব্রহ্মলিপ্সু সাধক তুমি শোন। তুমি যে ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবে, অবগাহন করিবে তাই তোমাকে বলি শোন। তুমি সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয়। তুমি পুত্র হইতেও প্রিয়, তুমি বিত্ত হইতেও প্রিয়, তাই তোমাকে এই দিব্যতত্ত্ব বলিতেছি। তুমি আমার হৃদয় গুহার সন্নিহিত হইয়াছ। বহু জন্ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া গুহার সন্ধান পাইয়াছ। গুহার দ্বারে বসিয়া সাশ্রুনয়নে প্রতীক্ষা করিতেছ। করজোড়ে বলিতেছ—"খুলে দাও আঁখি প্রাণ ভরে দেখি তুমি প্রাণ আমি প্রাণী।"—আবার বলিতেছে—

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।'

পূতচরিত্র শিষ্য, ব্রহ্মনিষ্ঠ শিষ্য প্রথম স্তরে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দেখিলেও ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া জানে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অথবা অগ্নি মধ্যস্থ লৌহগোলক যেমন অগ্নিই হয় সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ গুরু ব্রহ্মেরই অংশ। এক বিন্দু জলেতে যেরূপ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন রহিয়াছে সেইরূপ এক কলসী জলেও একই অক্সিজেন হাইড্রোজেন আছে। যিনি হৃদয় গুহায় ব্রহ্মকে অনুভব করিয়াছেন, যিনি ইচ্ছা মাত্রই ব্রহ্মে অবস্থান করিতে পারেন তিনি ব্রহ্মেরই সমতুল্য। তাই

মুমুক্ষু সাধক প্রথম দৃষ্টিতেই গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি রাখে না। কোনও মুমুক্ষু সাধকই তাহার ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে মানুষ বলিয়া দেখে না। কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু বিরল। যাহা হউক আমি এক্ষেত্রে মুমুক্ষু সাধক ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কথাই বলিতেছি। গুরুগীতায় ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকেই গুরু বলিয়াছেন। কারণ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ গুরুই সেই চরাচর পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মকে দেখাইতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞ গুরু মুমুক্ষু শিষ্যের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া প্রথম দেখাইয়া দেন—সচ্চিদানন্দের সং স্বরূপটি। সত্তার অনুভূতি প্রথম হয়। অসং ও ধ্বংসশীল নাম রূপময় জগতের তলায় তলায় যে সত্তা রহিয়াছে সেই সং স্বরূপটি দেখাইয়া দেন। নাম রূপের বিনাশ হইলেও এই সত্তার কোন বিনাশ হয় না।—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।"—এই সতের কখনও অভাব নাই। অসতের কখনও বিদ্যমানতা নাই। অসং বলিয়া যাহা দেখিতেছ তাহাকেও ব্রহ্ম বলিয়া জান। সর্প বলিয়া যাহা দেখিতেছ তাহা রজ্জুই। রজ্জুর সত্তার উপর সর্পের অবভাস হইতেছে মাত্র। সর্প সত্য নহে রজ্জুই সত্য। এই নামরূপ যাহা দেখিতেছ, চরাচর যাহা দেখিতেছ তাহার তলায় তলায় রহিয়াছে এক বিরাট সত্তা। সেই সত্তাকে প্রথম দেখ—'ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।' আর প্রণত হইয়া বল—নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। এই সত্তাই বিশ্ব চরাচরের আশ্রয়। এই সত্তাই বিশ্বচরাচরের উপাদান। সত্তার সন্ধান পাইলে অনুভূতি আসে চৈতন্যের। যিনি সং তিনিই চিং। এ দুটি অবিনাভাবি বস্তু। তাই সত্তার অনুভূতি হইলে চিতের অনুভূতি সহজেই হয়। তখন শিষ্য প্রণত হইয়া বলে—'নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।' চক্ষুরুন্মীলিত হয়। দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শনের

একত্ব প্রতীতি জন্মিতে থাকে। তখনই প্রণত হইয়া শিষ্য বলে—'নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়।'

ধ্বংসশীল নামরূপের তলায় তলায় সত্তাকে দেখিতে দেখিতে চৈতন্য ও আনন্দময় ব্রহ্মের অনুভূতি জাগে। ব্রহ্মলিপ্সু সাধক সকল পাশ হইতে বিমুক্ত হয়।

সত্তাবোধ জাগিলেই সাধকের হয় মনোময় গ্রন্থি ছিন্ন। ছিন্ন হয় ভেদের সকল সংশয়। তখন সেই সাধক দেহধারী গুরুকে প্রণাম করিয়া বলে—তুমি ব্রহ্মা। ব্রহ্মা যেমন বিশ্বকে রচনা করিয়াছেন তুমিও সেইরূপ আমার অন্তরে সত্তার অনুভূতি জাগাইয়াছ। সেই সত্তার সঙ্গে তুমি যে যোগযুক্ত। সত্তা ও তুমি অভিন্ন। তুমি আমার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া এই তত্ত্ব জানাইয়া দিয়াছ। তুমি মুমুক্ষু সাধকের অন্তরে এমনি করিয়া ব্রহ্মকে রচনা কর। জগতের ধাঁধা ঘুচাইয়া ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠা দাও। তাই তুমি ব্রহ্মা তুমি রচয়িতা তুমি স্রষ্টা। হে স্রষ্টা হে ব্রহ্মবিদ্ ঋষি আমি তোমার মূর্ত্তিকে ধ্যান করিতেছি। যখন বিরাট সত্তায় থাকিতে পারি না তখন আমার এই ক্ষুদ্র চিত্ত তোমার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া বিশ্রাম লাভ করে। ক্ষুদ্র আমি সতত মহানকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। যদিও তুমি আমার অন্তরে মহানের উদ্বোধন করিয়াছ তবুও আমার এ ক্ষুদ্র আধার সে বিরাটকে ধারণ করিতে পারিতেছে না। তাই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া যেমন ভীত সন্ত্রস্ত অর্জ্জুন বলিয়াছিল—হে নারায়ণ! আমি তোমার এই বিশাল রূপ দেখিয়া ভীত হইয়াছি। তুমি একবার আমাকে চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তিতে দেখা দাও। তেমনি হে ব্রহ্মবিদ্ গুরু তোমার চরণে প্রণত হইয়া বলিতেছি—বিরাটকে আমি সতত বহন করিতে পারিতেছি না, তুমিই আমার ধ্যেয় বস্তু।

—'ধ্যান মূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ।' অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তুমিও যে ব্রহ্মদীপ্তিতে দেদীপ্যমান। তাই ক্ষুদ্র জীব আমি তোমার মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া বহুক্ষণ শান্তি লাভ করি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ গুরু শিষ্যকে নিরস্ত করিয়া বলেন—আরও শুদ্ধ হও, আরও নির্ম্মল হও, আরও পূতচরিত্র হও, আরও সমাহিত হও। সেই প্রজ্ঞা-ভূমিতে আরূঢ় হইতে হইবে। রূপে রূপে প্রতিরূপে সেই সত্তাকে আরও গভীরভাবে দেখিয়া তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান ব্রহ্মরসে অভিষিক্ত হইতে হইবে।

মুমুক্ষু শিষ্য গুরুবাক্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া মনোময় গ্রন্থিকে অতি-ক্রম করিয়া আবার তপস্যায় নিমগ্ন হয়। এবার দেখে রূপের তলায় তলায় যে সত্তা রহিয়াছে সে সত্তা প্রতিরূপের অন্তরে ও বাহিরে চিন্ময়রূপে দেদীপ্যমান। তাই প্রণত হইয়া বলে—'চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।' আবার প্রণত হইয়া বলে—'চিতিরূপেন যা কৃৎস্নম্ এতদ্‌ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।' প্রতি বস্তু ও জীব গ্রথিত রহিয়াছে ঐ চিন্ময় সূত্রে। প্রতি বস্তু ও জীব অভি-ষিক্ত হইতেছে ঐ চিন্ময় মধুক্ষরণে। প্রতি বস্তু ও জীব সন্ত-রণ করিতেছে ঐ চিন্ময় সমুদ্রে। জীবের অন্তরে অন্তরে জীবের বাহিরে বাহিরে শুধু চিন্ময় শুধু রসময়। প্রণত হইয়া বলে—ওগো প্রেমময় গুরো কি দেখালে আজ আমায়, সকল সংশয় ছিন্ন হইল। —'ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।' —হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন করলে, সেই পরাবরকে দেখাইলে; সেই মহাপ্রাণকে দেখাইলে। সেই মরণশীল বিশ্বের মাঝে সেই প্রাণকে সেই দিব্য চেতনাকে দেখাইলে। অহো ধন্যোহং ধন্যোহং

—ধন্য করিলে গুরু আজ। সেই মহাপ্রাণেরই কেন্দ্ররূপে উৎস-রূপে ব্রহ্মলিপ্সু শিষ্য দেখে তাহার ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে। তাই প্রণত হইয়া বলে—তুমি শুধু স্রষ্টা নহ, তুমি শুধু ব্রহ্মা নহ, তুমি বিষ্ণু। এই জীবলোকের মধ্যে চিন্ময় বিষ্ণুকে দেখাইলে। এত' মহাপ্রাণ সত্তায় চিরজাগ্রত ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুভিন্ন কাহারও দেখাইবার অধিকার নাই। তুমি মহাপ্রাণের উৎস, তাইত' আজ মহাপ্রাণকে দেখাইলে।

এমনিভাবে শিষ্য যখন আরও গভীরে সমাহিত হয় তখন আস্বাদন করিতে পারে গুরুর মহেশ্বর স্বরূপের। ক্রমে শিষ্য হয় স্থিতপ্রজ্ঞ। তখনই গুরু শিষ্যে অভেদ হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া বলে—"গুরুরেব পরং ব্রহ্ম।"—অভেদে ভেদ দেখে ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায়। এইরূপে ব্রহ্মলিপ্সু শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞ হন। তাই আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলেন—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' —মুমুক্ষু শিষ্যগণই অত্মজ্ঞান লাভ করিয়া এই পুণ্যতিথিতে বলেন—ওগো বিশ্ববাসী তোমরা আজ শোন—আমি গুরুকৃপায় গুরুর আশীর্ব্বাদে সেই তাঁহাকে জানিয়াছি। যাঁহাকে জানিলে সকল অন্ধকার ও ভয় দূর হয়। আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। যাঁহাকে জানিলে আর দুঃখ থাকে না, যাঁহাকে জানিলে সকল সংশয় ছিন্ন হয় সেই তাঁহাকে জানিয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপায়ই জানিয়াছি। তিনি আমাকে বরণ করিয়া-ছিলেন, তিমি আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনি আমাকে ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলিয়া নিয়াছিলেন। তাই আজ আমি এই পরাকাষ্ঠা গতি লাভ করিয়াছি। ধন্য হইয়াছি; কৃতকৃত্য হইয়াছি। তাই প্রণত হইয়া আজ বলিতেছি—

"ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুঃ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

আবার প্রণত হইয়া বলি—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দ্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আরও প্রণত হইয়া বলি—

অনেকজন্ম সংপ্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা—১৩৭০।

বঙ্গভাষা

পঁচিশে বৈশাখ আজ বাংলা ভাষাকে নমস্কার জানাইতেছি। খণ্ডিত বঙ্গ জননীকে নমস্কার জানাইতেছি। এই বাংলা ভাষায় যাঁহারা প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন সেই কাশীরামদাস, চণ্ডীদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বিবেকানন্দ, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিক ও কবিগণকে অভিনন্দন জানাইতেছি। বাঙ্গালী মরিবে না। যে জাতি তাহার মাতৃ-ভাষাকে অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করে সে জাতি মরে না। বাংলা রাজনীতি চক্রে পড়িয়া খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষা খণ্ডিত হইতে পারিল না। পূর্ব্ব পাকিস্থান অন্য ধর্মী হইলেও, তাহাদের কৃষ্টি পৃথক হইলেও তাহারা তাহাদের মাতৃভাষাকে ত্যাগ করে নাই; বরং মাতৃভাষাকে কায়েম রাখিবার জন্য বহু যুবক পূর্ব্ব পাকিস্থানে প্রাণ দিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্থান মাতৃভাষার প্রতি সম্মান দেখাইবার পূর্ব্বে যদি পশ্চিমবঙ্গ তাহার মাতৃভাষাকে সম্মান দেখাইতে পারিত তবে তাহা অধিকতর গৌরবের বস্তু হইত। বিলম্বে হইলেও বাংলার বর্ত্তমান রাজনীতিজ্ঞগণ তাঁহাদের সরকারী কাজে এই বাংলা ভাষাকে বরণ করিয়া নিজেদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আজ তাঁহাদিগকেও অভিবাদন জানাইতেছি।

আসামে ও বাংলার বাহিরের বাঙ্গালীগণ বাংলাভাষাকে সম্মান দিতে যাইয়া বহুস্থানে নির্য্যাতিত হইতেছে। আসাম বীরত্বের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ নির্য্যাতিত

হইয়া মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে পারে; মানুষ নির্য্যাতিত হইয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু ভাষা ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। কোন কোন কুৎসিত চিন্তাশীল সাহিত্যিক বাংলাভাষায় রসসঞ্চার করিবার জন্য কুৎসিত নাটক প্রভৃতি লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জনের পথ সুগম করিতেছে, তাহারা নিন্দাভাজন। কুৎসিত বেশভূষা দ্বারা কোন ব্যক্তিকে যেমন সুসজ্জিত করা চলে না, তেমনি কুৎসিত রসের সাহিত্য ভাষাকে গৌরবান্বিত করিতে পারে না, বরং ম্লান করে। বাংলার বাহিরের বাঙ্গালীরা এবং বাংলার অভ্যন্তরস্থিত বাঙ্গালীরা যদি সর্ব্বত্রই নিজের ভাষা ব্যবহার করিতে সচেতন থাকেন তাহা হইলে বাংলাভাষা আরও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। ঝি-চাকর, রিক্সাওয়ালা, কুলী প্রভৃতির সঙ্গেও অন্য ভাষা না বলিয়া বাংলাভাষা ব্যবহার করিবার জন্য প্রয়াসী হইলে ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় অনেক বাঙ্গালীই তাহা করেন না। আজ হইতে যেমন আমরা সরকারী কাজে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করিব, তেমনি বে-সরকারী কাজে, এমন কি হাটে, বাজারে, রাস্তায়, বিদেশেও এই ভাষাকেই প্রতিষ্ঠা দিতে প্রয়াসী হইব। এইরূপ সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেই আবার আমাদের মাতৃভাষা উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে। ভাষা উজ্জীবিত হইলে জাতি গৌরবান্বিত হয়। কিন্তু ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

বাংলাভাষাকে আমরা আমাদের বাংলার সরকারী কাজে এবং সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা দিলেও ভারতের অন্য দুইটি ভাষা ইংরাজী ও হিন্দী সন্তান-সন্ততিগণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন থাকিবে। নতুবা বাঙ্গালী বাংলার বাহিরে সরকারী কাজে

ও বিবিধ কাজে পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া পড়িবে। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক আছে, প্রতিভা আছে, রচনার শক্তি আছে তাই বাঙ্গালীর পক্ষে ভারতের অপর তুইটি প্রধান ভাষা এবং তাহার সঙ্গে দেবভাষা—যাহার সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির গভীর সংযোগ রহিয়াছে তাহাও বাঙ্গালী শিখিবে, পড়িবে ও লিখিবে। দেবভাষাকে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষাকে ত্যাগ করিলে ভারতের যাহা বৈশিষ্ট তাহাকেই ত্যাগ করা হইবে। ভারতের সমগ্র প্রাচীন দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি গ্রন্থ দেবভাষায়ই রচিত। তাই এই ভাষাকে উপেক্ষা করা চলিবে না। বিশুদ্ধ বাংলাভাষা সংস্কৃত ভাষারই অংশ মাত্র। অতএব বাংলাভাষা যাহারা আয়ত্ত করিতে পারিবে দেবভাষা শিক্ষালাভ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন নহে। বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সঙ্গে এই দেবভাষার গভীর সংযোগ রহিয়াছে। আজ বাঙ্গালীর এক নবজন্ম লাভ হইল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মদিনে। হে কবি! হে মহামনীষি! হে বাংলা ভাষার প্রাণদাতা তোমাকে পুনরায় অভিবাদন জানাইতেছি। তোমার অমর আত্মা বাঙ্গালী জাতিকে আশীর্ব্বাদ করুক। ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা—১৩৭০।

এস ব্রহ্মানন্দময়ী মা

'আগতশ্চরণে মাতো গৃহাণ হৃদয়াঞ্জলিম্।'

ব্রহ্মস্বরূপিনী বিশ্বেশ্বরী বিশ্ব-প্রসবিনী দুর্গতিহরা দুর্গার সঙ্গে আমাদের এই কথা ছিল—তাঁহার বিশ্বরূপকে আস্বাদন করিয়া, ভোগ করিয়া, প্রদক্ষিণ করিয়া যেদিন আবার তাঁহার চরণ প্রান্তে উপনীত হইয়া মা বলিয়া ডাকিব সেইদিন তিনি তাঁহার আনন্দময় নগ্নবক্ষে দশবাহু প্রসারিত করিয়া তুলিয়া লইবেন। বাসনা বিমুক্ত হইয়া, সংস্কার বিমুক্ত হইয়া আমরা তাঁহার শান্তিময় বক্ষে চিরতরে বিশ্রাম লাভ করিব। বাসনাই বন্ধন। সংস্কারই বন্ধন। 'নিজ হস্তে রজ্জু যাহে আকর্ষণ।' কথিত আছে পার্ব্বতী তনয় কার্ত্তিক ও গণেশ একদিন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবেন বলিয়া স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া প্রদক্ষিণে বাহির হন। গর্ব্বিত কার্ত্তিক তাঁহার দ্রুতগামী ময়ূরে চড়িয়া দূর দূরান্তরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু স্থিতধী গণেশ মাতৃমন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার ক্ষুদ্র মূষিক বাহনে চড়িয়া মা'কেই প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই মায়ের চরণ প্রান্তে উপনীত হইয়া বলিলেন—'আগতশ্চরণে মাতঃ গৃহাণ কুসুমাঞ্জলিম্।' কার্ত্তিক দীর্ঘদিন দীর্ঘপথ প্রদক্ষিণ করিয়া পার্ব্বতীর সান্নিধ্যে আসিয়া দেখেন গণেশ মায়ের কোলে মায়ের বক্ষ জড়াইয়া স্মিত হাসি হাসিতেছেন। কার্ত্তিক মায়ের নিকট অভিযোগ করিলেন—মা, গণেশ তোমাকে ফাঁকি দিয়াছে। তাহার মূষিক বাহন আমার ময়ূরের পূর্ব্বে কিছুতেই পৃথিবী

প্রদক্ষিণ করিয়া আমার আগে আসিতে পারে না। গণেশ হাসিয়া বলিলেন—আমি হৃদয়রথে আরোহণ করিয়া মাতৃমন্ত্র জপ করিতে করিতে মা'কেই প্রদক্ষিণ করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি—আমার মায়ের মধ্যেই অনন্ত বিশ্ব নিহিত রহিয়াছে। আমার মা বিশ্ব প্রসবিনী বিশ্ব পাতৃ ধাত্রী ও সংহন্ত্রী। এই মা'কে ফেলিয়া ত্রিভুবনে কোথাও কিছু নাই। অনন্তরূপে মা, অনন্তরূপের আশ্রয় মা। তাই আমি অনন্তরূপের পিছনে না ছুটিয়া অনন্তরূপের আধার ও আধেয় আমার এই বিশ্বেশ্বরী জননীকেই প্রদক্ষিণ করিয়াছি। কার্ত্তিকের গর্ব্বিত মস্তক প্রণত হইল। একই মায়ের তুই পুত্র। একজন বিশ্বকে দেখিল কিন্তু বিশ্বের মধ্যে মা'কে দেখিল না। মায়ের মধ্যেও বিশ্বকে দেখিল না। অন্যজন তাঁহার ধ্যানমগ্ন হৃদয়ে বিশ্বেশ্বরীকে দেখিয়া প্রণত হইয়া বলিল—

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং,
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি,
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তি নম্রাঃ॥

মাতৃপ্রেমে প্রেমিক স্থিতপ্রজ্ঞ পুত্রকে মা সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার যাত্রার শেষ হইল।

তোমাদের মধ্যেও এইরূপ তুই শ্রেণীর পুত্র রহিয়াছ। এক-দল এখনও বল—ধন দাও, জন দাও, মান দাও।—'ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।' আর একদল মা'কে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বলিতেছ—

'বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি
নিঃশেষে মোর কর এবার খালি

অন্তর মোর গোপনে দাও ভরে
শুধু তোমার প্রেমে, তোমার প্রেমে
তোমার প্রেমে।'

আবার প্রণত হইয়া বল—

'ঘাটে ঘাটে ফিরব না আর
ভাসিয়ে এই ভগ্ন তরী।'

ওগো কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে লও যত তোমার পাওনা দেনা। —'ত্বদীয়ং বস্তু দেবেশি তুভ্যমেব সমর্পয়ে।' তোমারই দেওয়া ধন, তোমারই দেওয়া জীবন, তোমারই দেওয়া মান, যশ এবার তোমারই থাক। আমি ধন, জন, মানের কল্পিত পোষাক পরিয়া আর তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহি না। তোমার দেওয়া জীবন তোমাকেই দিতে চাই। তাই জীবন অর্ঘ্য বহিয়া আনিয়াছি আজ। 'গৃহাণ জীবনাঞ্জলিম্'। বুঝিয়াছি —তোমাবিহীন জীবন নীরস মরুভূমি। বুঝিয়াছি তোমাবিহীন জীবন মহা শ্মশান। বুঝিয়াছি তোমাবিহীন জীবন ভীষণ দাবানল। বুঝিয়াছি তোমাবিহীন জীবন নরক হইতেও বীভৎস। বুঝিয়াছি তোমাবিহীন জীবন রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্যে পরিপূর্ণ। গর্ব্বিত হইয়াছি, লুণ্ঠিত হইয়াছি। সম্মানের পুষ্পরথে চড়িয়াছি, অসম্মানের পদতলেও নিষ্পেষিত হইয়াছি। যত পিপাসা তত জ্বালা, তত হাহাকার। উঠিয়াছে কত মিথ্যা উল্লাসের কল্লোল, রচিত হইয়াছে কত কল্পনার পুষ্পরথ। ব্যর্থ হইয়াছে সব আয়োজন। ব্যর্থ এই আশা মরীচিকা।—

'আগতশ্চরণে মাতঃ
গৃহাণ জীবনাঞ্জলিম্।'

আজ কার্ত্তিকের ন্যায় সুশোভিত ময়ূরকে বাহন করিয়া কল্পনার পুষ্পরথে আর চড়িতে চাহি না। ঐ শান্ত মাতৃভক্ত গণেশের ন্যায় তোমাকেই প্রদক্ষিণ করিতে করিতে শুধু বার বার বলিতে চাহি—'আগতশ্চরণে মাতঃ গৃহাণ হৃদয়াঞ্জলিম্।'

জানি না তোমরা কতজন ভক্ত গণেশের ন্যায় মাতৃভক্ত হইয়াছ। জানি না কতজন তোমরা শয়নে মাকে প্রণাম কর, নিদ্রায় মাকে ধ্যান কর। জানি না কতজন তোমরা যাহা ভোজন কর, যাহা দান কর, যাহা বৈধ ও অবৈধ কর্ম্ম কর তাহা মায়েতে সমর্পণ করিয়া কর। জানি না তোমরা কতজন রূপে, বর্ণে, গন্ধে, নামে, শব্দে, স্পর্শে মাকে দেখিয়া দেখিয়া বিচরণ কর। জানি না তোমরা কতজন ঐ চলিতে চলিতে মায়ের দিব্যরূপ হৃদয়পটে অঙ্কিত কর। সেই ভাগ্যবান আজ তোমরা সত্যই বলিতে সাহসী হইবে—'আগতশ্চরণে মাতো গৃহাণ হৃদয়াঞ্জলিম্।' মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবে—আমি আসিয়াছি, হৃদয় গলে নাই, চরণ টলে নাই কাহারও করুণ ক্রন্দনে। স্থির দৃষ্টিতে তোমার ঐ স্নেহমাখা মুখখানা ভাবিতে ভাবিতে তোমার ঐ চরণ প্রান্তে আসিয়াছি। মমতার গর্ত্তে পড়িয়াছিলাম, মোহের অন্ধকার ঘিরিয়াছিল কিন্তু মা তোমার ঐ করুণামাখা মুখখানা ভাবিতে ভাবিতে আজ তোমার চরণ প্রান্তে আসিয়াছি।

'ঋতং বচ্মি, সত্যং বচ্মি।'
'মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।
অনিরাকরণমস্তু। অনিরাকরণম্মেঽস্তু।'

হে ব্রহ্মময়ী জননী তুমি আমায় অস্বীকার করিও না। আমি তোমার পুত্র নই একথা আর বলিও না। আমার ক্ষত

বিক্ষত অঙ্গ দেখিয়া আমাকে আর প্রত্যাখ্যান করিও না। 'আগতো মলিনঃ শ্রান্তো।' হতে পারি মলিন, হতে পারি শ্রান্ত, ক্লান্ত; কিন্তু আজ তোমারই দ্বারে আসিয়াছি।—'অনিরাকরণমস্তু; অনিরাকরণম্‌মেঽস্তু।' আমিও যেন আর তোমাকে ভুলিয়া না যাই। আমিও যেন আর অভিমানভরে তোমার করুণায়, তোমার স্নেহে অবিশ্বাস না করি। করুণার সিন্ধুতীরে আসিয়া করুণার সিন্ধুনীরে যেন অবগাহন করিতে বিরত না থাকি। অঞ্জলি অঞ্জলি যেন ঐ সিন্ধুবারি পান করি।—'মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। অনিরাকরণমস্তু।'

তোমরা কতজন এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা নিয়া মুমুক্ষু তপস্বী সাজিয়া বান্ত পুরীষবৎ সমস্ত বাসনা কামনাকে বর্জ্জন করিয়া যোগারূঢ় হইবার জন্য আমার মায়ের সান্নিধ্য হইয়াছ তাহা তোমরাই জান। মন তোমাদের ক্ষীণ হইয়াছে কিনা, ব্রহ্ম-সত্তার অনুভূতি তোমরা পাইয়াছ কিনা, সত্তার অনুভূতি লাভ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়াছ কিনা, বাসনা কামনার মূল উৎপাটন হইয়াছে কিনা একবার তোমাদের অন্তরে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ। জ্যোতির্ম্ময়ী জননীর দিব্য আলোকে লক্ষ লক্ষ জন্মের অন্ধকারকে দূরীভূত করিয়া একবার সেই দিব্য আলোকে দেখিয়া লও—"কত কলুষ, কত ফাঁকি এখনও যে আছে বাকী মনের গোপনে।" যদি দিব্যচক্ষু লাভ না হইয়া থাকে, যদি মায়ের আলোকে জীবনকে উদ্ভাসিত করিবার কৌশল না শিখিয়া থাক তাহা হইলেও ভীত হইও না। শরণাগত হও। নিজের দীনতাকে দেখ। সেই দীনতার অর্ঘ্যই মায়ের চরণে নিবেদন কর। আরও প্রণত হইয়া বল—'আগতো মলিনঃ শ্রান্তো কৃপয়া দেহি দর্শনম্।' তদ্‌চারু চরণে ভক্তিং দেহি

দীন দয়াময়ি।' তোমার বিজ্ঞ পুত্রগণ, তোমার ব্রহ্মনিষ্ঠ ধীমান পুত্রগণ তোমার আনন্দ স্বরূপে নিমগ্ন হইবে জননী; কিন্তু আমিও তোমার করুণার সিন্ধুতীরে বসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বার বার বলিব—'অজ্ঞানান্ধ সুতে মাতঃ কৃপয়া দেহি দর্শনম্।' শুধু কৃপা। শুধু মাতৃ কৃপা। শুধু গুরুকৃপা। গুরুকৃপাহি কেবলম্; গুরুকৃপাহি কেবলম্। কৃপয়া দেহি দর্শনম্। নিজের রিক্ততাকে বুঝিয়া, নিজের দৈন্যকে চিনিয়া কাতরকণ্ঠে যদি আমার মাকে ঐ দৈন্যের পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিতে পার আর প্রণত হইয়া বলিতে পার—

'শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥'

তবে অচিরেই আমার ব্রহ্মময়ীকে লাভ করিবে। সকল সন্তাপ দূর হইবে। তোমার জীবনকে, তোমার হৃদয়কে অর্ঘ্যরূপে মায়ের চরণে ঢালিয়া দিতে পারিবে। তোমার দুর্গাপূজা, তোমার মা মা বলা, তোমার পাদ্য অর্ঘ্য রচনা করা, তোমার পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য নিবেদন করা সকলই সার্থক হইবে। ধন্য হইবে, কৃতকৃত্য হইবে। আর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গাহিতে পারিবে—

'ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরী মদাশ্রমং।
আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরী মদাশ্রমং।
ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা—১৩৭০।

অন্তরের বুভুক্ষা ও মা অন্নপূর্ণা

বুভুক্ষা অর্থাৎ ক্ষুধা সাধারণতঃ তিন প্রকারের—দেহের মনের ও অন্তরের। দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় স্ত্রী অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগের দ্বারা। কৈবল্য উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা
শরীরমাস্থায় করোতি সর্বম্
স্ত্রী অন্ন পানাদি বিচিত্র ভোগৈঃ
স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি—

মায়ায় আচ্ছন্ন জীব দেহকেই সর্ব্বস্ব মনে করে এবং সেই দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য পার্থিব যাবতীয় চেষ্টা ত' করেই, ভগবানের নিকটেও প্রার্থনা করে। চাকুরী, ব্যবসা, কৃষি প্রভৃতি নানাবিধ বৈশ্য ও শূদ্র বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের প্রচেষ্টার নামই—দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির পার্থিব প্রচেষ্টা। এই যাবতীয় চেষ্টার মূলেই রহিয়াছে—দেহের তুষ্টি ও পুষ্টি বিধানের ইচ্ছা। জন্মের পর জন্ম মানুষ এই দেহের তুষ্টি ও পুষ্টির জন্য মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গৃহ স্ত্রী অন্ন পানীয় প্রভৃতি সংগ্রহে নিরত থাকে। কিন্তু দেহীর দেহ কালে ধ্বংস হয়। তাহার সম্পূর্ণ পরিতুষ্টি বিধান হয় না। এই দেহের সঙ্গে আছে মন। এই মনের ক্ষুধা আরও দুর্ণিবার। পুত্র বিত্ত ও যশের আকাঙ্ক্ষায় মন সদা উন্মত্ত থাকে। কত বিত্ত হইলে মন সন্তুষ্ট হইবে তাহা মন নিজেও জানে না। কত পুত্র হইলে ও কিরূপ গুণবান পুত্র হইলে মন তুষ্ট হইবে তাহা মন নিজেও বলিতে পারে না।

যশের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলে। এই দেহের ও মনের পরিতুষ্টির জন্য বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে। বিশ্বকে একটা প্রকাণ্ড পাগলা গারদ বলা চলে। নানা দেশের লোক নানা ভাষায় শুধু কলরব ও আর্ত্তনাদ করিয়া বেড়াইতেছে এই দেহের ও মনের তুষ্টির জন্য। হিন্দু শাস্ত্র বলে জীবের চুরাশি লক্ষ যোনি ঘুরিতে হয়, তাহার মধ্যে আশি লক্ষ যোনি স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ ও ইতর প্রাণীর মধ্যেই কাটিয়া যায়। চার লক্ষ হয় মানব জন্ম। মানুষের মধ্যেও ত' ইতর ও সম্ভ্রান্ত রহিয়াছে, অজ্ঞ ও বিজ্ঞ রহিয়াছে, নাস্তিক ও আস্তিক রহিয়াছে। স্বয়ং ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥"

হে অর্জ্জুন! তোমার এবং আমার বহু জন্ম হইয়াছে। আমি তাহা জানি, কিন্তু তুমি তাহা জান না।

আবার শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"

বহু জন্মের পর আত্মজ্ঞান পিপাসুগণ পরম-ব্রহ্ম স্বরূপ আমাকে লাভ করিয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়াছে—একমাত্র দেহের ও মনের তুষ্টি ও পুষ্টি বিধানই জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য নহে। মানুষের মধ্যে রহিয়াছে তাহার এক আধ্যাত্মিক ক্ষুধা। দেহের ক্ষুধা—স্ত্রী অন্ন পানাদি ভোগের দ্বারা সাময়িক নিবৃত্তি হয়। মনের ক্ষুধা—অর্থ পুত্র ও যশের দ্বারা সাময়িক প্রশমিত হয়। কিন্তু অন্তরের ক্ষুধা সেই অন্তরাত্মাকে লাভ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই মিটে না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই গাহিয়াছিলেন—

যতই আমার দুহাত ভরে উঠুক ধনে
তোমায় আমায় হয়নি জানা সে কথা রয় মনে।

রাজপুত্র বুদ্ধদেব তাই রাজ সিংহাসন ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন পরম ধনের সন্ধানে। তাঁকেই জানিতে হইবে, আত্মাকেই জানিতে হইবে, ভগবানকে পাইতে হইবে। ইহাই জীবনের চরম কথা। যাত্রার পরিসমাপ্তি, বাসনার পরিপূর্ণতা সেই দিনই হইবে যে দিন সেই অন্তরের ক্ষুধার্ত্ত বৈরাগী বলিয়া উঠিবে—আমি তাঁহাকে পাইয়াছি যাঁহাকে পাইলে আর কিছুই পাওয়ার বাকী থাকে না। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন—পতি যে পত্নীকে ভালবাসে তাহা পত্নীর তৃপ্তির জন্য নহে পরন্তু আত্মার তৃপ্তির জন্য। স্বামী পত্নীকে ভালবাসিয়া পত্নীর মধ্যে নিজের অন্তরাত্মাকেই ভালবাসেন। যে তপস্বী স্বামী পত্নীর দেহে ও রূপে মুগ্ধ না হইয়া পত্নীর আত্মাকেই মুগ্ধ নয়নে দেখেন তিনিই পত্নীকে ভালবাসিয়া আত্মাকেই ভালবাসিতে পারেন। পত্নী যে পতিকে ভালবাসে তাহা পতির তৃপ্তির জন্য নহে। নিজের আত্মা পতির মধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া সেই আত্মাকেই ভালবাসেন। পতির দেহকে নহে, পতির ধন ও বৈভবকে নহে। পিতা যে পুত্রকে ভালবাসেন তাঁহার পুত্রের মধ্যে নিজের আত্মাকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়াই ভালবাসেন অর্থাৎ পুত্র শুধু পিতার দেহের ও মনের অংশই নহে, আত্মার অংশ ইহা অনুভব করেন। এইরূপ আত্মদৃষ্টি নিয়া যে পতি পত্নীকে ভালবাসে, যে পত্নী পতিকে ভালবাসে, যে পিতা পুত্রকে ভালবাসে, যে পুত্র পিতাকে শ্রদ্ধা করে সেই আত্মাকে লাভ করিতে পারে।

ইহা আত্মলাভের একটি উপায়। ইহা অন্তরের ক্ষুধা নিবৃত্তির একটি পথ। কিন্তু হায়, মানুষ আত্মদৃষ্টি নিয়া মানুষকে ভালবাসিতে পারে না। অধিকাংশ পতি পত্নীর রূপকে ও কর্মকে ভালবাসে। অধিকাংশ পত্নী স্বামীর রূপ ও ধনকে ভালবাসে। অধিকাংশ পিতা পুত্রের বুদ্ধিমত্তাকে ও আনুগত্যকে ভালবাসে। অধিকাংশ পুত্র পিতামাতার অন্ধ স্নেহকে ভালবাসে। —যাজ্ঞবল্ক্যের সাধ্বী পত্নী মৈত্রেয়ী তাঁহার পতির মধ্যে নিজের আত্মার প্রতিবিম্বকে দেখিয়াই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন—তাই যাজ্ঞবল্ক্য যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বে দুই পত্নীর মধ্যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাগ করিয়া দিতে চাহিলেন তখন মৈত্রেয়ী ঐশ্বর্য্য প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি তোমার এই পার্থিব ধন চাহি না, আমি আমার আত্মার প্রতিবিম্ব তোমার মধ্যে দেখিয়াছি, আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তোমার মধ্যে ও আমার মধ্যে আরও নিবিড় ভাবে আমার সেই অমৃতময়কে দেখিব। আত্মাই ত' জ্ঞাতব্য, দ্রষ্টব্য, নিদিধ্যাসিতব্য। উপনিষদের ঋষিগণ বার বার এই অমৃতময় আত্মাকে লাভের কথাই বলিয়াছেন। আত্মাই অমৃত, আত্মাই অভয়, আত্মাই শান্তি। গীতায়ও উপনিষদের প্রতিধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

স শান্তিম্ আপ্নোতি ন কামকামী

বহুদিকে যাহাদের মন ছুটিয়াছে তাহারা মৃত্যু হইতে মৃত্যুকেই পায়, বহু বাসনায় কামনায় যাহারা মুগ্ধ হইয়াছে তাহারা অশান্তি হইতে আরও অশান্তিতে ডুবে। কামকামীর শান্তি নাই। অশান্ত ব্যক্তির সুখ নাই। কিন্তু মোহগ্রস্ত মন, মায়াচ্ছন্ন দেহী একথা বুঝিয়াও বুঝে না। দেহের ও মনের

গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া—অন্তর রাজ্যে অনেক মানুষই প্রবেশ করিতে পারে না। পৃথিবীতে এত মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে মানুষ যত সুখের সন্ধানে বাহিরে ছুটিয়াছে। অন্তরের ডাক মানুষ শুনিতে পায় না।

তোমরা দেহের ও মনের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বহু জন্ম ঘুরিয়াছ, বহু দেবদেবীর উপাসনাও করিয়াছে। এবার দৃষ্টি ফিরাও। অন্তরে যে তোমাদের এক ক্ষুধার্ত্ত বৈরাগী বসিয়া রহিয়াছে—সে শুধু পার্থিব—ধন, জন, মান, স্ত্রী, অন্ন, পানীয় দ্বারাই তুষ্ট হইতে চাহে না। চাহে সেই—অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান অমৃতময়কে। বলিতে পার এই অমৃতময় কি ক্ষুধার অন্ন জল দিবে? রোগে ঔষধ দিবে? বিপদে পরিত্রাণ করিবে? উত্তর পাওয়া গিয়াছে—হাঁ দিবে। চিরদিনই তপস্বিগণ বলিয়া আসিতেছেন—সেই ব্রহ্মের স্পর্শ পাইলে অত্যন্ত সুখ অনুভব হয়, দুঃখ থাকে না। "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শং অত্যন্তং সুখমশ্নুতে।" আরও বলিয়াছেন—

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।"

ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে যে ভোগ হয়, তাহাই দুঃখ দেয়। তপস্বিগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—তাঁহাকে লাভ করিলে দুঃখ থাকে না, দৈন্য থাকে না, রোগ ভয় ও মৃত্যু ভয় থাকে না। তিনি পিতা, তিনি বান্ধব, তিনি স্নেহময়ী জননী। তাঁহাকে লাভ করিলে কোন বিত্ত লাভেরই আর প্রয়োজন বোধ থাকে না। তখন দেহের ক্ষুধাও থাকে না, মনের ক্ষুধাও থাকে না।

আজ তোমরা মা অন্নপূর্ণার দ্বারে আসিয়া শুধু কি অন্ধ

কাঙ্গালের ন্যায় অন্ন জল, স্ত্রী পুত্র, ধন মান ও প্রতিষ্ঠাই চাহিবে? বহু জন্ম ব্যাপিয়া যে বৈরাগী শিব তোমাদের অন্তরে বসিয়া বার বার উদাত্ত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছে—

ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন

বহু কর্ম্মের দ্বারা নহে, বহু পুত্রের দ্বারা নহে, বহু ধনের দ্বারা নহে। অমৃতত্বকে লাভ করিতে হইলে একমাত্র তপস্যা ও ত্যাগের দ্বারাই লাভ করিতে পারিবে। তাহার ডাক কি শুনিবে না? তপস্যার বহ্নি অন্তরে জ্বাল, আর সেই বহ্নিতে আহুতি দিতে দিতে দীপ্ত কণ্ঠে বল—

ব্যূহরশ্মিন্ সমূহ তেজো
যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

এই আদিত্য মণ্ডলে অর্থাৎ সৌর জগতে যে চিন্ময় পুরুষ—অখণ্ড মণ্ডলাকারে বিদ্যমান রহিয়াছেন, আমি তাহা হইতে অভিন্ন, আমি দেহ ও মনের অধীন কাঙ্গাল জীব নহি। আমি যেমন দেহের ও মনের নানা বাসনার আবর্জ্জনায় সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছি, তুমিও নানা বর্ণ গন্ধ ও রূপের জাল রচনা করিয়া এক চাক্‌চিক্যময় সৌরজগৎ রচনা করিয়া জীবের গতিপথকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছ। তুমি তোমার এই চাক্‌চিক্যময় লোভনীয় রশ্মি সমূহ সংযত করিয়া আমার মায়ের আবরণ অপসৃত করিয়া দাও। শুধু সূক্ষ্মে নহে, স্থূলেও যাহা আমার তপস্যার—যাহা আমার কৃষ্টির ও ঊর্দ্ধগতির প্রতিবন্ধক তাহা নির্ম্মমভাবে আমার সম্মুখ হইতে ধুইয়া মুছিয়া দাও। আমি আমার যথার্থ স্বরূপটী দেখিয়া জরা ও মৃত্যুকে চিরতরে অতিক্রম করিব। ওগো দুরত্যয়া প্রকৃতি! তুমি

তোমার মোহজালকে সংযত কর। আমি জানিয়াছি এই আদিত্যমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত যিনি চিন্ময় পুরুষ তিনিই আমার আত্মা বিভু, তিনিই আমার সর্বস্ব ধন। তিনিই জীবের যথার্থ জীবন এবং চরম ও পরম আশ্রয়। আজ অঘটন ঘটনা পটীয়সী প্রকৃতি তোমাকে অতিক্রম করিয়া আমার গুণাতীত অব্যয় স্বরূপে প্রবেশ করিতে চাহি। আমাকে তোমার কল্যাণতম রূপটী দেখিতে দাও। আমি আমার শিবস্বরূপকে মঙ্গলস্বরূপকে, শিবতরকে দেখিব। ত্রিনয়ন লাভ করিয়া দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শনে একই মঙ্গলময় শিবকে দেখিয়া দিব্যজীবন লাভ করিব, আত্মস্থ হইব। আমি জানিয়াছি যিনি শিব তিনিই শিবতর, যিনি প্রকৃতি তিনিই পুরুষ, যিনি অন্নপূর্ণা তিনিই মহেশ্বর, যিনি পরা প্রকৃতি তিনিই পরম পুরুষ। আমি জানিয়াছি দৃশ্য রূপে যিনি দ্রষ্টারূপেও তিনি, দর্শনশক্তি তাঁহারই লীলাবিলাস মাত্র।

তোমরা ঐ মূর্ত্তিমান মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর চরণ প্রান্তে বসিয়া—আজ উদাত্ত কণ্ঠে প্রার্থনা কর—'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি' তোমার কল্যাণতম রূপ দেখিতে চাহি তোমার নাটকীয় রূপ নহে। তারপর যে রূপে আকার নাই, যে রূপে গুণ নাই গন্ধ নাই, সেই অরূপের রূপ দেখিতে চাহি। শুধু দেখিতে চাহি না, তাহাতে প্রবেশ করিতে চাহি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি। কাঙ্গাল শিশু তোমরা আজ মায়ের চরণ প্রান্তে আসিয়া আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বুঝিয়াছ তাঁহার অবিদ্যামূর্ত্তিকে দেখিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে, আর বিদ্যামূর্ত্তিকে দেখিয়া অমৃতত্ব লাভ করিবে—অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে। অপরা প্রকৃতির

মধ্যে, বিশ্ববৈচিত্রের মধ্যে, প্রতি দৃশ্যের মধ্যে চিন্ময় বিভুকে দেখিয়াছ কি? দেখিয়াছ কি পরা প্রকৃতিরূপে সেই পরম পুরুষই লীলায়িত হন? গুরু শিষ্যকে এই মন্ত্রেই উদ্বুদ্ধ করেন, এই দিব্য চক্ষুই দান করেন। বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে শিবতরকে মঙ্গলতরকে দেখাইয়া দেন, তোমরাও বহুবার শুনিয়াছ—গুরু ও বেদান্তবাক্যে আস্থাবান হইয়াছ। তবে কেন প্রবেশ করিতে পারিবে না ঐ কল্যাণতম দিব্যধামে? বৎস! ঐ মহামায়াকে প্রণাম কর, ঐ মায়াধীশ মহেশ্বরকে প্রণাম কর। আর প্রাণার্ঘ্য অর্পণ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে বল—

আবির্ভূর্য়় পরং ব্রহ্ম কুরু মাং মুক্তবন্ধনং।

আবার প্রণত হইয়া বল—

দৃশ্যাদৃশ্য-প্রভূত বাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞান-দীপঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশ্ব মনঃ প্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা—১৩৭১।

উত্তম মধ্যম ও অধম ভক্ত

ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট সেই সকল ভক্তই প্রিয় হন যাঁরা নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্ম চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। ব্রহ্ম চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন এ কথা বলিতেই কেহ কেহ হয়ত ভাবিয়া লইতেছেন একবারে সমস্ত কর্ম বন্ধ করিয়া এবং নবদ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহারা দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টাই স্থাণুবৎ অবস্থান করিবেন। ব্রহ্মে অবস্থিত এবং ব্রহ্মবিহার এই দুই অবস্থার মধ্যে ব্রহ্মে অবস্থিতির অবস্থা গভীরতম অবস্থা। ব্রহ্মে অবস্থিতিকালে ইন্দ্রিয় নিচয় বাহির হইতে অন্তর্চেতনায় ডুবিয়া যায়। তাহাকে যোগারূঢ় অবস্থা বা স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা বলে। কিন্তু এই স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায়ও অধিকক্ষণ কোন তপস্বী থাকিতে পারেন না। তপস্বিগণ স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা লাভ করিবার পূর্বে যেমন ব্রহ্মে বিহার করিতে করিতে প্রজ্ঞা ভূমিতে অবস্থান করেন তেমনি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মতেই বিহার করেন। ব্রহ্ম বিহারেরও বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। প্রতি নামে রূপে এমন কি আকাশে বাতাসে পর্য্যন্ত এক চিন্ময় দিব্য পুরুষের স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে সাধকগণ কর্ম করিতে করিতেও ব্রহ্মে অবস্থান করিতে পারেন। ইহা যোগে আরূঢ় হওয়ার একটী দিব্য সোপান। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ হেরে—শুধু চোখ দিয়েই কৃষ্ণকে দেখে না, প্রতি অঙ্গ দিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করে, কর্ণ তাঁহার বাণী শুনে, ত্বক তাঁহারই

মধুময় স্পর্শ পায়, নাসিকা তাঁহার অঙ্গের দিব্য গন্ধে আমোদিত হয়। হাত স্পর্শ করে সেই চিন্ময় বিভুকে—অন্তরিক্ষে পর্য্যন্ত। যাঁহারা মূর্ত্তির চিন্তা করেন এবং প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে মন্ত্র জপ করেন তাঁহারাও জীবত্বের গণ্ডীকে ভেদ করিয়া আসিয়া পৌছেন এই দিব্য চেতনার ক্ষেত্রে—ব্রহ্ম বিহারের ভূমিতে। ব্রহ্ম বিহারের ভূমিটীও জীবনের পরাকাষ্ঠা ভূমি নহে। তবে ইহা এক অপূর্ব আনন্দদায়ক রাজ্য। যে একবার এই রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছে তাহাকে বিশ্বের কোন বৈভবই মুগ্ধ করিতে পারে না। ব্রহ্মবিহারের স্পর্শে এমন এক দিব্য সুখময় অবস্থা হয় যাহার তুলনা কোন সুখের সঙ্গে হয় না।

সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শং অত্যন্তং সুখমশ্নুতে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন—যে রসগোল্লা খাইয়াছে সে আর চিটা গুড় চাহে না। এই ব্রহ্মরসের আস্বাদন যে একবার পায় সত্যই জগতের কোন ভোগ লালসা তাহাকে আর মুগ্ধ করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণকে এই ব্রহ্ম বিহারের ভূমিতে আকর্ষণ করিয়া নিতে চেষ্টা করেন। যে তপস্বী নিজেকে গুরুর নিকট অন্তর উন্মুক্ত করিয়া ঢালিয়া দিতে পারেন তিনি গুরু শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া এই দিব্য ভূমিতে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহারা সুসংযত হন, শান্ত হন, নির্লোভ হন, জিতেন্দ্রিয় হন, বিচক্ষণ ও কর্মকুশল হন। উত্তম তপস্বিগণ কর্মকুণ্ঠাপরায়ণ হন না। কারণ কর্মের মধ্য দিয়াও তাঁহারা ব্রহ্ম বিহারের সুযোগ লাভ করেন। অবশ্য সে কর্মের ও অত্যন্ত বহির্ম্মুখীন কর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে। যে কর্মের মধ্যে কপটতা আছে, চালাকী আছে, অন্যকে পরাভূত করার প্রবৃত্তি আছে, জিঘাংসা আছে

সে সকল কর্ম তপস্বিগণ করিতে ক্লেশ পান। সাত্ত্বিক ও নির্মল কর্ম ব্রহ্ম বিহারের অনুকূল হয়, কিন্তু তামসিক ও রাজসিক কর্ম তপস্বীদের প্রতিকূল কর্ম। বলিতেছিলাম যাঁহারা গভীর নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্ম বিহারের পথে অগ্রসর হইতে চাহেন এবং পর্বতসম বাধাকে লজ্ঘন করিবার জন্য তাঁহারই কৃপা পুনঃ পুনঃ চাহেন তাঁহারাই উত্তম ভক্ত।

মধ্যম ভক্তগণ দুই দিক বজায় রাখিয়া প্রথম চলিতে চেষ্টা করেন, তাহার সংসারও যেন অটুট থাকে এবং ভগবানের কৃপাও যেন তিনি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু তুলাদণ্ডের দুই দিক সমান ওজনে কখনই থাকে না। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে সংসারে আসক্ত হন। মধ্যে মধ্যে ভগবৎ চিন্তা করিয়াও আনন্দ লাভ করিতে চাহেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন দুই প্রকারের মাছি আছে—এক প্রকারের মাছি শুধু মধুতেই বসে, আর এক প্রকারের মাছি মধুতেও বসে, গুড়েও বসে এবং নোংরা স্থানেও বসে। মধ্যম ভক্তগণ দ্বিতীয় স্তরের মাছির ন্যায়। তবে তাঁহাদের গুরুতে একান্ত নিষ্ঠা থাকে এবং ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু হন। নিজেরা গভীর ভাবে তপস্যা করিতে না পারিলেও তপস্বিগণের সেবায় অথবা দেবসেবায় অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা জানেন ঈশ্বর পরায়ণদের সেবা করিলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। অবশ্য অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাঁহারা পুণ্য অর্জন করিতে চাহেন না। কারণ তাঁহাদের অন্তরে থাকে পাপের ভয় ও পরকালের চিন্তা। এ সকল ভক্তেরাও অনেকে উত্তম ভক্তে পরিণত হন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা।

তৃতীয় স্তরের ভক্তগণ প্রথম আসেন সাংসারিক কষ্ট দূর করিবার জন্য, অথবা ব্যবসা বাণিজ্যে লাভবান হওয়ার জন্য।

এইরূপ স্তরের সাধকদের বহু গুরু থাকে, কারণ তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান চাহে না, চাহে সাংসারিক অভ্যুদয়। তাই যে সাধক বিভূতির বলে তাহাদের অভীষ্ট বস্তু দিতে পারে তাহারা তাঁহার ভক্ত হয়। আকাঙ্ক্ষার শেষ তাহাদের থাকে না তাই শ্রদ্ধাও দৃঢ়ভাবে রাখিতে পারে না। অভাব পূরণ হইলে তাহারা কয়েকদিনের জন্য খুব অনুগত ও কৃতজ্ঞ হয়। আবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় অভাব যখন আসে তখন তাহা পরিপূরণ না হইলে বিকারগ্রস্ত হয় এবং উপর্য্যুপরি কয়েকটি অভিলাষ পূর্ণ না হইলেই অন্য গুরুর শরণাপন্ন হয়। তাহারা ভাবে বিগলিত হইয়া যেমন প্রশংসা করিতে পারে তেমন পর মূহূর্ত্তে নিন্দা করিতে করিতে গুরুকে বর্জন করিয়া অন্য গুরু গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। তাহারা ধর্মপ্রাণ নহে। বরং একটু ধর্মভীরু। পরকালের ভয় যাহাদের আছে এবং শাস্ত্রে যাহাদের বিশ্বাস আছে তাহারা গুরু ত্যাগ করিতে সাহসী হয় না। কিন্তু অন্তরের শ্রদ্ধা হারাইয়া ব্যথিত জীবন যাপন করে। যাহাদের শাস্ত্র বাক্যে গভীর শ্রদ্ধা নাই এবং পরকালের ভয় কম তাহারাই পুনঃ পুনঃ গুরুত্যাগ করিয়া নূতন নূতন গুরু গ্রহণ করে। তাহারা ভগবান অপেক্ষা অর্থ যশ ও ভোগের বস্তুই বেশী চাহে। অধুনা এইরূপ তৃতীয় স্তরের ভক্তের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। গীতাকারও বলিয়াছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততাং অপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি যদি ভগবানকে চায় তাহা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে ২।৪ জনই গভীর আন্তরিকতার সহিত ভগবানের জন্য তপস্যা করিয়া থাকে। অর্থাৎ উত্তম সাধক বহু ভাগ্যের

ফলে বহু জন্মের বহু তপস্যার ফলে হয়। তবে অধম সাধকগণই একদিন মধ্যম সাধক হইবে এবং বহু জন্মের পর গুরু কৃপায় উত্তম সাধক পদবাচ্য হইবে।

উত্তম ভক্তদের সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। বহু সুকৃতির বলে ভগবানে একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা আসিয়া থাকে। কথা হইতেছে মধ্যম ও অধম ভক্তগণকে লইয়া। মধ্যম ভক্তগণও গুরুতে গভীর শ্রদ্ধা থাকিলে এবং সাধু সজ্জন ও তীর্থের সেবা করিলে উত্তম পদ লাভ করিতে পারে। অধম ভক্তগণের মধ্যে যাঁহাদের গুরুতে দৃঢ় শ্রদ্ধা হয় এবং পটোয়ারী বুদ্ধি থাকে না, তাঁহারা ধীরে ধীরে সুকৃতিবান হইয়া উত্তম গতি লাভ করিতে পারেন। গুরুকে যাহারা পদে পদে শুধু পরখ করিতেই থাকে এবং অভীষ্ট লাভ হইলে শ্রদ্ধায় গলিয়া পড়ে আর অভীষ্ট পূরণ না হইলেই ক্ষিপ্ত হয় তাহাদের দুর্গতির কথা ভাবিতে গেলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এইরূপ কপটাচারী ভক্ত অপেক্ষা যাহারা নীতিবান অর্থাৎ কাহাকেও প্রবঞ্চনা করে না, পরের ধন অপহরণ করে না, পরনারী গমন করে না, সদাচারী ও মিষ্টভাষী কিন্তু জপ তপ করে না তাহারা বরং ইহাদের চেয়ে উত্তম বলা চলে।

তাই তোমাদিগকে বলিতে চাহি—তোমরা মিথ্যাচারী ও কপটাচারী হইও না। মিথ্যাচারী ও কপটাচারী হইলে প্রথম নিজের বিবেককেই প্রবঞ্চনা করিবে এবং বিবেক বিমূঢ় হইয়া অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে।

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা—১৩৭১।

শ্রীশ্রীদুর্গার অবিদ্যা ও বিদ্যামূর্ত্তি

মা এবার বড় ভয় লেগেছে। তোমার ভয়ঙ্করী অবিদ্যা-মূর্ত্তির হলাহলপূর্ণ ফেনিল গর্জ্জন দেখিয়া ও শুনিয়া বড় ভয় লেগেছে। তুমি এবার মাতৃমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, বিদ্যামূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, ডাকিনী শাকিনী ঘোরা উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছ। তোমার এই তামসী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া বড় ভয় লেগেছে। তুমি ছিন্নমস্তা ও ধূমাবতী কালরাত্রি ও মোহরাত্রিরূপে যে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছ, তাহা দেখিয়া বড় ভয় লেগেছে। জানি—বসন্তের পর প্রচণ্ড দাবদাহযুক্ত গ্রীষ্ম আসিয়া যখন ধরার পৃষ্ঠকে শুষ্ক করে, তৃণ গুল্মকে ভস্মীভূত করে, তৃষ্ণায় অধীর হইয়া একবিন্দু বারিপাতের জন্য যখন লক্ষ লক্ষ জীবজন্তু আর্ত্তনাদ করিতে থাকে তখন তুমি বর্ষার বারিধারারূপে বর্ষিত হইয়া ধরাকে অভিষিক্ত কর, তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণ কর। তোমারি বিগলিত করুণাময় বারিতে অভিষিক্ত হয় ধরণী ও আশ্রিত জীবকুল; প্রচণ্ড দাবদাহের শেষ হয়। পুষ্পে, পল্লবে, ধনে, ধান্যে, বসুন্ধরা আবার সুশোভিত হইয়া উঠে। কিন্তু মা এবারে তোমার গরল গর্জ্জিত তামসী মূর্ত্তির—অবিদ্যা মূর্ত্তির রূপান্তর দেখিতেছি না। এতদিন জানিতাম ভারত তোমার প্রতিমূর্ত্তি। ভারতের বৃক্ষ লতা ফল ফুল তোমারই ব্যক্তমূর্ত্তি। ভারতের নরনারী তোমারই দিব্য অঙ্গকান্তি নিয়া গড়া। কিন্তু আজ ভারতের নরনারীর প্রতি তাকাইয়া ভারতের ধন ধান্যের প্রতি তাকাইয়া

শুধু দেখিতে পাই তোমার ঘোরা তামসী মূর্ত্তি—অবিদ্যা মূর্ত্তি। যে সাধকগণ তাহাদের ধ্যানে প্রতিরূপে তোমারই দিব্য প্রাণের সঞ্চরণ দেখিত, তাহারা দেখিতে পায় এক জিঘাংসাপূর্ণ ঘোর তামসী মূর্ত্তির নগ্ন তাণ্ডব নৃত্য। যে সাধকগণ প্রেম ও প্রীতি নিয়া "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রতি ভারতবাসীকে প্রণতি জানাইত, যে সাধকগণ "নমস্তে বহুরূপায়" বলিয়া অনন্তরূপের মাঝে তোমারই সৌম্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইত, যে সাধকগণ "ভূতানি ত্বর্গা ভুবনানি ত্বর্গা" বলিয়া স্থাবর জঙ্গমকেও প্রণতি জানাইত, যে সাধকগণ "স্ত্রীয়ঃ নরশ্চাপি পশুশ্চ ত্বর্গা" বলিয়া ত্বাহু প্রসারিত করিয়া তোমাকে পবিত্র বক্ষে বরণ করিয়া লইত, যে সাধকগণ "মহী স্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি" বলিয়া তোমার পদরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ধূলায় ধূসরিত হইত, যে সাধকগণ "অপাং স্বরূপ স্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ" বলিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি তোমারি প্রেমবারি পান করিত, অবগাহন করিয়া দেহের জ্বালা ও মালিন্য দূরীভূত করিত, তাহারাও আজ তোমার ঘোরা তামসী মূর্ত্তি দেখিয়া—উগ্র অবিদ্যা মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত, অবসন্ন, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। যে সাধকগণ প্রতি নরে নর-নারায়ণ তোমাকে দেখিয়া ও নারায়ণ জ্ঞানে তোমারই সেবা করিয়া সংসারেও স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিত, গৃহস্থাশ্রমেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত, আজ সেই নর-নারায়ণদের মধ্যে দানবের উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত ও মূঢ়, দানবের বিষদ্রংষ্ট্রা দংশনে জর্জ্জরিত ক্ষতবিক্ষত। তাই আজ বড় ভয় লেগেছে মা, বড় ভয় লেগেছে। ভারতবাসীর পরিণাম দেখিয়া—তোমার অবিদ্যা মূর্ত্তির তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া তাই আজ বড় ভয় লেগেছে মা, বড় ভয় লেগেছে। শৈশবে ও যৌবনে, পত্রে পুষ্পে বৃক্ষলতায়

পর্ব্বতগহ্বরে প্রান্তরে শৈবালে নদীকূলে তোমার যে সুষমামণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিয়াছি, বাল্যে ও যৌবনে তথাকথিত ইতর লোক সমাজেও যে পবিত্রতা লজ্জা ও সম্ভ্রম দেখিয়াছি, ভদ্রসমাজে যে প্রেম প্রীতি ও ঔদার্য দেখিয়াছি, সে সমস্তই আজ এক ঘোরা তামসী মূর্ত্তিতে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে, কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। ধূলি আজ তেমন মধুময় মনে হয় না, পবিত্র গঙ্গাবারি আজ মলমূত্রের-দ্বারা কলুষিত, নগরে নগরে আজ বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাব, বিপুল বাস্তুহারার দল তোমার বিশাল ধরার বুকে একটি ধূলিকণাকেও আপন বলিয়া আশ্রয়স্থল বলিয়া বিশ্রান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। "স্ত্রীয়ঃ নরশ্চাপি পশুশ্চ দুর্গা" বলিয়া যখন নরনারীকে প্রণতি জানাইতে যাই, তখন দেখিতে পাই নারীর চরিত্র কলুষিত, নারী ধর্ষিত, নারী লাঞ্ছিত, নারী নির্য্যাতিত। পুরুষগণ হিংস্র শার্দ্দুলের ন্যায় পরস্পর হানাহানি করিতেছে, দৈত্যের ন্যায় একে অন্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেছে, অতর্কিতে একে অন্যকে সংহার করিতেছে, নির্দ্দোষীকে অলক্ষ্যে তীক্ষ্ণ শূলাঘাতে নিধন করিতেছে অথবা অসহায় ভীরু শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিতেছে। সৈন্যগণ বৃথা আস্ফালন করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করিতেছে, রাষ্ট্র ধুরন্ধরগণ স্বীয় সুখ সুবিধা এবং দলের পুষ্টিবিধানের জন্য কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়াছে। কোথায় তোমার প্রেম, কোথায় তোমার প্রীতি, কোথায় তোমার ভালবাসা, কোথায় তোমার বীরত্ব, কোথায় তোমার দেবীমূর্ত্তি, কোথায় তোমার কমলা সিদ্ধিদাত্রী মঙ্গলা মূর্ত্তি? চতুর্দ্দিকে শুধু হাহাকার, চতুর্দ্দিকে শুধু বিভীষিকা। সাধককুল সন্ত্রস্ত, যোগীগণ স্তব্ধ, প্রেমিক হতবাক, নিষ্কাম কর্ম্মযোগী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। তাই বড় ভয় লেগেছে মা, বড়

ভয় লেগেছে। ওগো দুর্গা, ওগো বিশ্বেশ্বরী, ওগো সুখদা, বরদা, তোমার এই ঘোর তামসী মূর্ত্তি দেখিয়া আজ সত্যই বড় ভয় লেগেছে মা, বড় ভয় লেগেছে।

জানি তোমার প্রকৃতি অংশে তুমি যুগপৎ দয়া ও নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি, জানি তোমার প্রকৃতি অংশে তুমি যুগপৎ কোমল ও কঠোর, জানি তোমার প্রকৃতি অংশে তুমি আলো আঁধারের সংমিশ্রণ, জানি তোমার প্রকৃতি অংশে তুমি "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং"। আবার ইহাও জানি তোমার প্রকৃতি অংশে ঘোর অমানিশা নামিয়া আসিলেও তাহার অবসান হয়, পূর্ণমাসির পূর্ণচন্দ্র গগনললাটে উদিত হয়। জানি তোমার প্রকৃতি অংশে ষড়ঋতু পালাক্রমে ঘুরিয়া বেড়ায়, জানি তোমার প্রকৃতি অংশে প্রতিদিন সূর্য্য উঠে ও ডুবে, কিন্তু আজ দেখিতেছি তোমার বিধির জগতেও অবিধি, তোমার আলো আঁধারের জগতে শুধু আঁধার, তোমার পাপ পুণ্যের জগতে শুধু পাপ, তোমার প্রেম ও নিষ্ঠুরতার জগতে আজ শুধু নিষ্ঠুরতা, হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, পরশ্রী-কাতরতা। কোথাও ছায়া নাই শুধু দাবদাহ। কোথাও শীতল বায়ু নাই, কোথাও আশ্রয় নাই। লক্ষ লক্ষ মানবকুল উত্তাল তরঙ্গের প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, লক্ষ লক্ষ মানবকুল ঘোর অমানিশার অন্ধকারে বিকট অট্টহাসি হাসিতে হাসিতে অজ্ঞাত শ্মশানচুল্লীতে ঝাঁপ দিতেছে। একি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তোমার, একি বিভীষিকাপূর্ণ তাণ্ডব নৃত্য তোমার। ওগো রুদ্রাণী, ওগো করালবদনা ঘোরা, ওগো ভয়ঙ্করী অবিদ্যামূর্ত্তি, তোমার এই প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিতেছি তবে কি এই অমানিশার শেষ হইবে না, তবে কি এই হলাহলপূর্ণ সাগর অতিক্রম করা যাইবে না? বড়

ভয় লেগেছে মা, বড় ভয় লেগেছে।

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে"। তোমার অবিদ্যা মূর্ত্তির মধ্যে তোমাকেই দেখিতে পাইলে অর্থাৎ শুধু অবিদ্যাকে না দেখিয়া পরাশক্তি তুমি অবিদ্যা মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছ ইহা দেখিলে. মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। তুমি নামরূপাত্মক এই চরাচর দৃশ্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া তোমার একাংশে বিশ্বকে ধারণ করিয়াছ, আর অন্য অংশে তুমি বিদ্যারূপে অন্তররাজ্যে শান্তিরূপে বিরাজিত রহিয়াছ। অবিদ্যার মধ্যে তোমাকে দেখিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর বিদ্যা মূর্ত্তিতে তোমাকে দেখিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। কিন্তু আজ তোমার অবিদ্যা মূর্ত্তির এমন লৌহপ্রাচীর তুমি নির্ম্মাণ করিয়াছ এবং সেই লৌহ প্রাচীরের মধ্যে এমন দাবদহ সৃষ্টি করিয়াছ, এমন বিষধর সরীসৃপ ও বৃশ্চিককুল সৃষ্টি করিয়াছ, যাহার দংশনে যাহার পীড়নে জীব শুধু আর্ত্তনাদই করিতেছে। একবার একটু শান্ত হইয়া তোমাকে দেখিবার, তোমাকে ভাবিবার, তোমাকে একটি প্রণাম করিবার অবকাশও পাইতেছে না। যে ভারতবাসী একদিন প্রভাতে আঁখি খুলিয়াই "দুর্গা দুর্গা" মন্ত্র জপ করিত, যে ভারতবাসী একদিন মধ্যাহ্নে সুশীতল সলিলে অবগাহন করিয়া পবিত্র দেহে মনে ও প্রাণে তোমার আসন রচনা করিত, যে ভারতবাসী একদিন সায়াহ্নে, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতি কর্ম্মে তোমারই অর্চ্চনা করিয়াছে ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত, তাহারা আজ বিভ্রান্ত। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোথায় অন্ন কোথায় অন্ন, কোথায় বস্ত্র কোথায় বস্ত্র, কোথায় ঔষধ কোথায় পথ্য, কোথায় একটু সান্ত্বনার কথা, কোথায় একটু ভালবাসার প্রলেপ উদ্‌ভ্রান্ত

হইয়া শুধু তাহাই খুঁজিতেছে। তাহাদের অন্তরে দাবদাহ, বাহিরে প্রচণ্ড দাবানল। শুধু আর্ত্তনাদ, শুধু অশ্রুপাত। পশুর ন্যায় আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুনে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছে। অভাবের তাড়নায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যতই বাহির বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে ততই এক রাক্ষসীর করাল মূর্ত্তি আসিয়া তাহাদিগকে চর্ব্বণ করিতেছে। তাই বড় ভয় লেগেছে মা, বড় ভয় লেগেছে।

ভীত সন্ত্রস্ত কম্পিত বক্ষ লইয়া, অশ্রুশিক্ত আঁখি ও গণ্ড লইয়া এই তরঙ্গায়িত বিশ্বের বুকে শতবিষে জর্জ্জরিত হইয়াও আজ ক্ষীণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া জানাইতেছি—তুমি তোমারই পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আবার এই বিশ্বে অবতীর্ণ হও। "দৈত্যানাং দেহনাশায়" ও ভক্তদের অভয় প্রদানের জন্য তুমি আবার বিদ্যামূর্ত্তিতে প্রকটিত হও। তোমার বর পুত্রগণও তোমার অবিদ্যা মূর্ত্তির ফেলিন সাগরের বিষতরঙ্গ দেখিয়া আজ সন্ত্রস্ত। তুমি বলিয়াছিলে—

"তদা তদা অবতীর্য্যাহং
করিষ্যামি অরি সংক্ষয়ম্।"

যখনই ধরার পৃষ্ঠ পাপে পরিপূর্ণ হইবে, যখনই ধরার পৃষ্ঠ অসুর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইবে, তখনই আমি আসিব। আমার অবিদ্যা মূর্ত্তিকে ধুইয়া মুছিয়া বিদ্যা মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইব। তুমি বলিয়াছিলে—"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ তুর্গতিং তাত গচ্ছতি"। যাহারা কল্যাণের পথে একবার পা বাড়াইয়াছে, যাহারা একবার "মা" বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহাদের কখনও তুর্গতি হয় না। তুমি বলিয়াছিলে—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"।

জানি ইহা কলিযুগের প্রভাত কিন্তু এই প্রভাতেই অবিদ্যার প্রচণ্ড কালমেঘ আসিয়া বিদ্যা সূর্য্যকে একেবারেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আলো নাই আলো নাই। আলোর রেশটুকুও নাই। একটী খদ্যোতও তাহার ক্ষীণ আলোটুকু একবার জ্বালিতেছে না। দীপ নিভিয়াছে। এ ভয়ঙ্কর তামসী মূর্ত্তি তোমার—কলির প্রভাতেই সায়াহ্ন ঘোষণা করিতেছে। শুধু সাধারণ মানুষ নহে, তপস্বিগণও আজ নির্য্যাতিত, নিষ্পেষিত। অধার্ম্মিকগণ, আততায়িগণ, দস্যুগণ বিকট অট্টহাসি হাসিতেছে। তপস্বীদের আজ বল্কল পরিধান করিয়া, বৃক্ষের ফলমূল আহার করিয়া বনে অবস্থান করিবারও অধিকার নাই। অরণ্যবাসী গুপ্ত সাধকদের নিকট হইতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাবণ যেমন কর আদায় করিতে যাইয়া তাহাদের গাত্র হইতে রক্তমাংস ছিনাইয়া লইয়াছিল, সেইরূপ সত্যনিষ্ঠ শান্তিপ্রিয় অযাচক তপস্বীদের, অনিকেত তপস্বীদের নিকট হইতেও রাষ্ট্র ধুরন্ধরগণ নানা মিথ্যা আইনের শৃঙ্খল বিস্তার করিয়া মিথ্যার পথে টানিয়া লইতে প্রয়াসী হইয়াছে। বনের পশুগণ এখনও গভীর অরণ্যে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিতে পারে, খেচরগণ এখনও নগরের প্রান্তে নির্জ্জন পল্লীতে বৃক্ষশাখে নির্ভয়ে বসবাস করিতে পারে, কিন্তু মানুষের মাঝে আজ মানুষ নিশ্চিন্তমনে বাস করিতে পারে না। তোমার অবিদ্যার এই করালমূর্ত্তি ছিন্নমস্তা ও ধূমাবতীকেও পরাজিত করিয়াছে। ইহা যেন এক অচেনা অজানা প্রলয়ঙ্করী তামসী মূর্ত্তি। এ ধূম্রলোচন নয়, এ রক্তবীজ নয়, এ মহিষাসুর নয়, এ শুম্ভ নিশুম্ভ নয়। এ তোমার উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা মূর্ত্তিও নয়। এ তোমার ডাকিনী শাকিনী মূর্ত্তিও নয়। ইহা অতি ভয়ঙ্কর, অতি ঘোরা, নিষ্ঠুরা, ক্রূরা মূর্ত্তি তোমার।

তাই বলি—বড় ভয় লেগেছে মা, বড় ভয় লেগেছে।

তপস্যার প্রভাবে তোমার এই রূঢ়া ক্রূরা মূর্ত্তিকে, নিষ্ঠুরা সংহারিণী মূর্ত্তিকে অপসৃত করা তপস্বীদের সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রত্যেক সাধকই আজ অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত, ভীত। তাই আবার বলি—"দৈত্যানাং দেহনাশায়" ও ভক্তদের অভয়ের জন্য তুমি স্বেচ্ছায় এই অবিদ্যা মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া একবার বিদ্যা মূর্ত্তিতে সৌম্যা মূর্ত্তিতে প্রকটিত হও। দানবে পরিপূর্ণ হইল বিশ্ব, ধর্ম্মের নামে আততায়ীর দল গ্রাস করিল মানব সভ্যতাকে। তাই ডাকি মা—"দৈত্যানাং দেহনাশায়" ও ভক্তদের অভয়ের জন্য তুমি এসো প্রহরণধারিণী দনুজদলনী অভয়া বরদা মঙ্গলা বিদ্যামূর্ত্তিতে! তুমি আবির্ভূতা হও। শুধু কল্পনায় নহে—যেমন বাস্তব তোমার ক্রূর মূর্ত্তিতে ধরার বক্ষকে আচ্ছাদিত করিয়াছ, নির্য্যাতিত করিতেছে, তেমনি অতি বাস্তব বিদ্যা মূর্ত্তিতে—সুখদা বরদা মূর্ত্তিতে অন্তর ও বাহির আলোকিত করিয়া তুমি আবির্ভূতা হও, প্রতিষ্ঠিতা হও। অবিদ্যা মূর্ত্তি দূরীভূত হোক্, বিদ্যামূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া শান্তিবারি সিঞ্চন করুক। তোমার মঙ্গলহস্ত বুলাইয়া দাও প্রতি সন্তানের ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে ও অন্তরে। রক্তাক্ত ও ক্ষত বিক্ষত দেহ তোমার বক্ষে তুলিয়া ধর—হতবাক্ কণ্ঠে আবার মাতৃমন্ত্র উচ্চারিত হোক্—শোকাশ্রু প্রেমাশ্রুতে পরিণত হোক্ মানবকুল দিগ্‌দর্শনের দিব্য দৃষ্টি লাভ করুক। ওগো মঙ্গলা, ওগো শোভনা, ওগো শঙ্করি, ওগো পুত্রবৎসলা! তুমি কি আবার ফুটিয়া উঠিবে না? তুমি কি আবার জ্ঞানবর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিবে না? তুমি কি আবার ভারতবাসীর মুখে হাসি ফুটাইবে না? তারা কি "তুর্গা"

"দুর্গা" বলিবে না—তারা কি আবার "মা" "মা" বলিয়া নির্ভয়ে শান্তিলাভের জন্য তোমার দিকে বাহু বাড়াইবে না? এসো বরদা, এসো রোগহারিণি, এসো শোকনাশিনি, এসো শান্তি প্রদায়িনি, এসো মোক্ষদায়িনি! আবার ভূলুণ্ঠিত আর্ত্ত সন্তানদের প্রণতি গ্রহণ কর।

সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতম্ অম্বয়ৈতং
কা তে স্তুতিঃ স্তব্য পরা পরোক্তিঃ।
নমো নমস্তে—নমো নমস্তে।

প্রণতি লহ—, শুধু প্রণতি লহ—।

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা—১৩৭১।

রাষ্ট্র ও ধর্ম

দেশে যদি শান্তি বিরাজিত থাকে তবেই ধর্মপ্রাণগণ শান্ত মনে তপস্যা করিতে পারেন। দেশের শান্তি নির্ভর করে রাষ্ট্রনেতাদের উপর। পূর্বে রাষ্ট্রনেতাগণ তপস্বীদের নিকট হইতে রাষ্ট্র পরিচালনার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বর্তমান কালে রাষ্ট্র ধুরন্ধরগণ ধর্মদ্বেষী বা ধর্ম নিরপেক্ষ অথবা কোন কোন রাষ্ট্র-ধুরন্ধর ধর্মকে শিখণ্ডী করিয়া মানবতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে। রাষ্ট্রনেতাগণ অনেকে বলিয়া থাকেন ধর্মের সংস্পর্শ থাকিলে বিশুদ্ধ রাষ্ট্রনীতি চলে না। ধর্ম সম্বন্ধে যাহাদের কোন জ্ঞান নাই তাহারাই এরূপ বালকোচিত উক্তি করিয়া থাকেন। ধর্মের খোলস নিয়া অথবা আনুষ্ঠানিক ধর্ম নিয়া হানাহানি হইয়াছে ও হইতেছে ইহা সত্যকথা কিন্তু এই হানাহানির পটভূমিতে ধর্মের নামে কি ছদ্ম লালসা অন্তরে রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কেহ দেখে না। ধর্ম কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নহে। মানবতার উৎকর্ষ সাধনের নামই ধর্ম। ধর্মের নামে যখন অর্থ নারী ও যশের প্রতি প্রলুব্ধ হয় তখনই ধর্মকে সাম্প্রদায়িক ধর্মের মধ্যে আনিয়া ম্লান করে। যেখানে ধর্মের নামে হানাহানি হইয়াছে দেখা যায় সেখানে রহিয়াছে হয় অর্থ বা রাজ্যের লালসা, নয়ত যশ বা নারীর প্রলোভন। বৈরাগ্যবান ধার্মিকগণ রাজ্য চাহে না, যশ চাহে না। নারীর রূপেও তাহারা প্রলুব্ধ হয় না। রাষ্ট্র-ধুরন্ধরগণই ধর্মের ছদ্ম পোষাক পরিয়া অনেক সময় রাজ্য ধন বা যশ

আহরণের জন্য লালায়িত হন। হিন্দু সমাজে বৈষ্ণব শাক্ত বা বৈদান্তিকগণ প্রতিষ্ঠার লোভে রাষ্ট্রধুরন্ধরদের প্ররোচনায় অনেক সময় পরস্পর পরস্পরের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। হিন্দু ধর্ম্মকে খর্ব করিবার জন্য বুদ্ধ-ধর্মাবলম্বী রাজাগণ বহুস্থানে কলহ করিয়াছে ধর্ম্মের জন্য নহে, রাজ্য বিস্তারের জন্য। মুসলমান হিন্দুদের প্রতি যে অত্যাচার করে তাহার মূলে রহিয়াছে রাজ্য অর্থ নারী ও প্রতিষ্ঠার প্রলোভন। একজন খাঁটী হিন্দুর সঙ্গে একজন খাঁটী মুসলমানের ধর্ম্ম নিয়া কখনও বিরোধ নাই। বর্ত্তমানে এই যে কমিউনিষ্টদের মধ্যে হানাহানি হইতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে রাজ্য বিস্তার ও প্রতিষ্ঠালাভের মোহ। কমিউনিষ্টরাও একটা সম্প্রদায়। তাহাদের মতবাদগুলিকে কেহ ধর্ম্মের মতবাদও বলিতে পারে অথবা অধার্মিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার মতবাদও বলিতে পারে। বৈষ্ণবরা যেমন বিষ্ণুকে না মানিলে বা বৈষ্ণবদের নীতি না মানিলে বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হয়। সেইরূপ কমিউনিষ্টরাও লেলিন বা ষ্টালিনকে না মানিলে অথবা তাহাদের নীতি না মানিলে দল হইতে বিতাড়িত হয়। ভারতের কংগ্রেস সম্প্রদায় সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। গান্ধীজীকে বা নেহেরুজীকে যে মানিবে না অথবা তাহাদের মতবাদের সঙ্গে বিবেক সায় না দিলেও মানিতে বাধ্য হইবে না তাহাকেই দল হইতে বিতাড়িত করা হইবে। ইহাই দলের মূল সূত্র। বিরুদ্ধ দল যেখানে প্রবল হয় সেইখানেই দলে দলে হানাহানি হয়। মানবতার আদর্শ তখনই ম্লান হয়। ধর্ম্ম মানব সমাজকে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ লাভের পথই শিক্ষা দেয়। তথায় হানাহানির কোন কথা নাই। অভ্যুদয় লাভের মধ্যে আছে অতি শান্ত

পবিত্রভাবে প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রীতি রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহের উপদেশ। নিঃশ্রেয়স্ শিক্ষা দেয় ত্যাগ বৈরাগ্য ও সংযম। ত্যাগের মধ্যে সংযমের মধ্যে অথবা বৈরাগ্যের মধ্যে অহংকারের স্থান নাই। অহংকার যাহাদের পর্বতপ্রমাণ তাহারাই সেই অহংকারকে আরও পরিপুষ্ট করিবার জন্য চাহে রাজ্য, চাহে ধন, চাহে যশ। বৈরাগ্যবান পুরুষের রাজ্যে যেমন প্রয়োজন নাই ধনেও তেমনি প্রয়োজন নাই। তাহার ধন মান সবই মানবের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হয়। বেশ সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে ধর্ম্মের মতবাদে একটু পার্থক্য থাকিলেও হানাহানির কোন কথা সেখানে নাই। কিন্তু রাজ্যলিপ্সুদের, ধন লিপ্সুদের, যশ লিপ্সুদের, ভোগ-লোলুপদের সংঘর্ষ বাধে প্রতি পদক্ষেপে।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রধুরন্ধর অনেকেই ধর্ম্মের নামে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, ধর্ম্ম মানি না ও বুঝি না ইহা বলিতে গর্ব বোধ করেন। দেখা যায় এইরূপ উক্তি যাহারা করেন তাহাদের মধ্যে মানবতার আদর্শ বেশ ম্লান। ইহাদের মধ্যে অনেকে চরিত্রবল হারাইয়া ফেলে, মদ্যপ হয় এবং স্বার্থপর হয়। অন্তরকে উদার ও উন্মুক্ত তাহারা করিতে পারে না দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হয়, ইন্দ্রিয়গুলি বহির্ম্মুখীন হয়, হৃদয় শুষ্ক হয়। ধীরে ধীরে মানবতা হইতে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ওহে গর্বিত বীর পুরুষগণ! তোমরা কি নিজের অন্তরে একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়াছ, 'ধর্ম্মদ্বেষী হইয়া মানবতার আদর্শকে খর্ব করিয়া তোমার মধ্যে আসুরিক প্রবৃত্তি সকল কেমন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে? নিজেকে বিশ্লেষণ কর। তুমি যে মানব সমাজের কলঙ্ক হইতে চলিয়াছ। তুমি ভাবিয়াছ ধর্ম্ম মানেই নামাবলী গায়ে দেওয়া, ধর্ম্ম মানেই নাকে

বা কপালে তিলক কাটা, ধর্ম্ম মানেই একাদশী বা অমাবস্যার ব্রত উপবাস করা, ধর্ম্ম মানেই মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত করা; ধর্ম্ম মানেই সত্য নারায়ণের পাঁচালী শোনা। ওহে অজ্ঞ পণ্ডিত! তুমি যে ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পার নাই। ঋষিদের পদপ্রান্তে একটু শান্তমনে বস, উপনিষৎ, গীতা ও বেদান্তের বাণী গভীর শ্রদ্ধা নিয়া শোন। হিন্দু হইয়াও তুমি হিন্দুত্বের কিছুই জান নাই। অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তোমার বাস্তব জ্ঞান কিছু নাই। তথাকথিত ধার্মিকগণ তোমার সংশয় অপনোদন করিয়া দিব্যপথের সন্ধান দিতে পারিতেছে না। তাই বলি কতগুলি খোলস দেখিয়াই, কতগুলি আবরণ দেখিয়াই ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করিও না। উপনিষৎ, বেদান্ত ও গীতাকে বুঝিতে চেষ্টা কর, যদি তুমি যথার্থই মানবতার উৎকর্ষতা সাধন করিতে চাহ। ভুলিও না তুমি মানব গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, মানুষের মনুষ্যত্ব লাভই যথার্থ ধর্ম্ম। মনুষত্ব শিক্ষা দেয় উদারতা, প্রীতি, প্রেম ও বৈরাগ্য; হানাহানি নহে। রাষ্ট্র শিক্ষা দেয় পরমত অসহিষ্ণুতা, আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের স্পর্দ্ধা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা ও বিদ্বেষ। রাষ্ট্রকে সুপথে পরিচালিত করিতে হইলে এবং রাষ্ট্রদ্বারা মানব গোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করিতে হইলে তোমাদিগকে ধর্ম্মের অর্থাৎ মানবতার আদর্শই গ্রহণ করিতে হইবে। গীতা ও উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। নান্যঃ পন্থা অয়নায়। ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা—১৩৭১।

শ্রীশ্রীসরস্বতী মাতার পরা ও অপরা মূর্ত্তি

মা সরস্বতীকে বিদ্যাদায়িনী দেবী বলা হয়। ভক্তগণ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বলেন—বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে। কিন্তু বিদ্যা বলিতে তাহাদের ভিতরে অর্থাৎ মনে বিশেষ কোন ভাবেরই উদয় হয় না। ছাত্রগণ পরীক্ষায় পাশ করাকেই বিদ্যালাভ মনে করে। নৃত্যকার ও গায়কগণ ভাল নাচিতে পারা বা গাহিতে পারাকেই বিদ্যা মনে করে। কিন্তু ঋষিগণ বিদ্যাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—পরা ও অপরা। অপরা বিদ্যার দ্বারা পার্থিব সম্পদ লাভ হয়, ভোগের বস্তু পাওয়া যায়। অপরা বিদ্যার দ্বারা পার্থিব সম্পদ লাভ হইলেও তাহা অনিত্য ও পরিণামে দুঃখদায়ক। অপরা বিদ্যা হইল—ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি। আর পরা বিদ্যা হইল—যাহার দ্বারা পরম শান্তি, তথা আনন্দকে লাভ করা যায়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

হে অর্জ্জুন! বেদের কর্ম্মকাণ্ড কামনামূলক ও সংসার-বন্ধনের হেতু। তুমি গুণাতীত নিত্য সত্য প্রজ্ঞাভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হও। তথায় অবস্থান করিলে অপ্রাপ্তির প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাপ্ত বস্তু রক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা আর থাকিবে না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'যা হারিয়ে যায়
তা আগলে বসে রইব কত কাল।'

আরও বলিয়াছেন—

বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে
প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।

আরও বলিয়াছেন—

যা আছে আমার সবই যদি দিই সঁপিয়া তোমায়
নাহি তাহে ক্ষয়, সবই জেগে রয় তব মহামহিমায়।

পরা বিদ্যা যাঁহারা লাভ করিতে চাহেন, পরম শান্তি যাঁহারা লাভ করিতে চাহেন, অফুরন্ত আনন্দ যাঁহারা লাভ করিতে চাহেন তাঁহাদের অন্তর হইতে এই ধ্বনি উত্থিত হয়। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বিরল। কশ্চিৎ ধীর ব্যক্তি বাহির হইতে অন্তরে দৃষ্টি ফিরাইয়া এই অমৃতত্ব লাভের প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি ত্রিগুণের বশ। অধিকাংশ ব্যক্তি কামকামী। প্রেয় প্রার্থী। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

ইহলোকে যদি কর্ম্মের সিদ্ধি চাও তাহা হইলে দেবতার উপাসনা কর। এই কামকামিগণই সরস্বতী দেবীর অপরা মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকে। তাহারা শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী হইতে চাহে, তাহারা বিজ্ঞ শিল্পী হইতে চাহে, তাহারা বিজ্ঞ জ্যোতিষী হইতে চাহে, তাহারা অফুরন্ত ধন সম্পদের অধিকারী

হইতে চাহে, দীর্ঘায়ু চাহে, পুত্র কলত্র চাহে। তাই—'বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে' বলিতে, ছোট বালকটি শুধু পরীক্ষায় পাশ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিলেও, বয়স্কগণ তাহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী কিছু চাহে। তজ্জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় দেবদেবিগণের বিভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া অপরাবিদ্যাকামিগণ তাহাদের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। যাহারা নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শী হইতে চাহে তাহাদের সরস্বতী নাচিবার ভঙ্গিমায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। যাহারা গায়ক ও বাদক তাহাদের সরস্বতী গায়িকার ও বাজনাওয়ালীর ভঙ্গিমায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রচলিত দেবীর ধ্যানের সঙ্গে এসকল দেবদেবীর সম্পর্কও থাকে না। নিজ নিজ কল্পনা অনুসারে তাহাদিগকে গঠন করিয়া থাকে। শুধু সরস্বতীই নহে, দুর্গা, কালী, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর গঠন ভঙ্গিমাতেও এই গঠন বৈচিত্র্য দেখা যায়। মানুষের কামনার অন্ত নাই। দেবতাকেও নানা ভঙ্গিমায় গঠন করিবার অন্ত নাই। কেহ বংশীধারী কৃষ্ণকে চাহে, কেহ লাড্ডু গোপাল কৃষ্ণকে চাহে, কেহ বা সুদর্শনধারী কৃষ্ণকে চাহে। ইহারা প্রত্যেকেই কামকামী, অর্থাৎ অপরা বিদ্যার সাধক।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ঋষি মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

যিনি সংসার মুক্তির র্হেতুভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যা রূপিণী ও সনাতনী, তিনিই আবার সংসার বন্ধনের কারণ স্বরূপা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী।

অতএব আমরা দেখিতেছি বিদ্যার অর্থাৎ সরস্বতীর দুইটি

রূপ। মূলে তিনি এক হইলেও অপরাবিদ্যা উপাসকের নিকট অর্থাৎ কামকামীদের নিকট, অর্থাৎ সংসারের অভ্যুদয়কামীদের নিকট যে ভাবে আবির্ভূতা হন ও দেখা দেন, বর ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন, মোক্ষকাঙ্ক্ষীদের নিকট, পরম শান্তি ও আনন্দ-কামীদের নিকট ঠিক সে ভাবে দর্শন দেন না। অপরাবিদ্যা মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া তিনি যুগ-যুগান্তর, লোক-লোকান্তর মোহিনী মূর্ত্তিতে নানা আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া জীবকে ঘুরাইয়া থাকেন। তাহারা বার বার জন্মায়, বার বার মরে। সুখের সঙ্গে অশেষ দুঃখ পায়। মানের সঙ্গে অপমান পায়। দুঃখের হাত হইতে একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি পায় না। বহু জন্ম এই মায়ার আবর্ত্তনে, এই অপরা শক্তির আবর্ত্তনে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই ঘূর্ণাবর্ত্তের শেষ হয় সেইদিন যেদিন আর্ত্ত হইয়া বলিতে পারে—

পরিশ্রান্ত জনে লয়ে যাও নাথ!
সংসার সাগর পারে।

বলিতে পারে—পুনর্জ্জন্ম দুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো!

বলিতে পারে—সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতং,
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ॥

তখনই অলক্ষ্যে চোখের আবরণ খুলিয়া দিয়া তিনি সামনে আসিয়া বলেন—মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।—আমাকে যে চাহে, শান্তিকে যে চাহে, বিমুক্ত হইতে যে চাহে সে মায়াজালকে ছিন্ন করিয়া আমার অঙ্কে স্থান লাভ করে। তাই ঋষিগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—তং ত্বং অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। তাই ঋষিগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—আবিরাবির্ম এধি। তাই ভক্তগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন—আমার হাসি মিছে,

কান্না গিছে; তুমি সামনে এসে দাঁড়াও হে। আর তোমার বেদ বেদান্ত চাহি না; নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ চাহি না, তোমার শিল্পকলা, বাণিজ্য চাহি না, তোমার ধন, সম্পদ পুত্র কলত্র চাহি না—; ইহার মধ্যে অমৃতত্বের আস্বাদন পাই নাই।—যেনাহং নামৃতা স্যাং তেনাহং কিং কুর্য্যাম্—আমি যে অমৃতত্বের প্রত্যাশী, আমি যে পরাবিদ্যার প্রয়াসী, আমি যে ঘুমকে ঘুম পাড়াইয়া একমাত্র শ্যামানামকেই ব্রহ্ম জানিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছাড়িয়াছি। নির্নিমেষ লোচনে শুধু তোমারই পানে চাহিয়া রহিয়াছি। আমি জানিয়াছি অতি দৃঢ়ভাবেই জানিয়াছি—

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি,
য ইহ নানেব পশ্যতি।

যে নানা চায়, বহু চায়, নামরূপকে চায়, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে যায়। তোমার জগতের মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়াছি, তোমার জগতের করাল মূর্ত্তিও দেখিয়াছি, তোমার জগতের প্রিয়জনদের মধ্যে ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট ভাব শতশত বার দেখিয়াছি, অন্তর নিংড়াইয়া যাহাকে গভীরভাবে ভালবাসিয়াছি তাহার নিকট হইতেও প্রবল আঘাত পাইয়াছি। কামনার শেষ কিছু রাখ নাই। প্রাপ্তির শেষও কিছু রাখ নাই। সব চাহিয়াছি। সব পাইয়াছি। আবার সব হারাইয়াছি। এখানেই পাইয়াছি; তোমার এই বিশ্বেই পাইয়াছি। আবার তোমার এই বিশ্বেই হারাইয়াছি। বর্ষার বর্ষণে ও প্লাবনে যে নদীকে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি, নিদাঘের শুষ্কতার দিনে তাহাকেই আবার মরুভূমি অপেক্ষাও শুষ্ক দেখিয়াছি। একদিন যাহারা ভালবাসায় স্নেহে মমতায় অন্তরকে রসাল করিয়া তুলিয়াছিল, পরদিনই তাহারা উচ্ছিষ্ট পত্রের ন্যায় আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। বহু জন্ম এই

দৃশ্য দেখিয়াছি। বহু জন্ম এইরূপ সংঘাত পাইয়াছি। তাই এবার বলি—

আমার হাসি মিছে, কান্না মিছে,
তুমি সামনে এসে দাঁড়াও হে।

শুধু সামনে এসে দাঁড়ান নয়। অন্তর ও বাহির পরিপূর্ণ করিয়া তুমি তোমার আনন্দে প্রেমে নিমজ্জিত করিয়া রাখ। যে প্রেমে নিমজ্জিত হইয়া ঋষি বলিয়াছিলেন—

ত্বয়ৈকয়া পূরিত মম্বয়ৈতৎ,
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ।

যে প্রেমে নিমজ্জিত হইয়া আত্মস্থ ঋষিগণ—পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন—

কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ।
বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি॥

সেই শান্তিভূমিতে অবস্থান করিয়া ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
ত্বমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

সেই প্রজ্ঞাভূমিতে অবস্থান করিয়াই ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিভেতি কুতশ্চন॥

এই যে তোমার শাশ্বত সত্তা, এই যে তোমার চিন্ময় অনাবিল সত্তা, এই যে তোমার আনন্দঘন পরিপূর্ণ সত্তা, যেখানে অবস্থান করিলে দুঃখের লেশ মাত্র থাকে না, যেখানে অবস্থান করিলে মৃত্যুভয়ও থাকে না;—এই পরাবিদ্যামূর্ত্তিতে

নিমজ্জিত কর। অবস্থিতি দাও। আরও নিবিড়ভাবে তোমার প্রেমময় বক্ষে আমায় বেষ্টন করিয়া ধর। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের নিকট যে পরামূর্ত্তিতে তুমি আবির্ভূত হইয়াছিলে ও হইতেছ সেই পরামূর্ত্তিতে আমাকে অঙ্কে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। আমিও প্রণত হইয়া বার বার বলি—

যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দ্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা।
ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা—১৩৭১।

মা অন্নপূর্ণাকে চাও, না অন্ন চাও ?

তোমরা কাহাকে চাও ? মা অন্নপূর্ণাকে চাও, না তাঁহার দান চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্বিধ দান চাও ? তোমাদের অন্তরে অন্তরে বহুদিন বহুবার উঁকি মারিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেখিয়াছি তোমরা মা অন্নপূর্ণাকে চাও না। শুধু চাও মায়ের দানগুলি। ভালবাস বস্তু, ভালবাস উপকরণ, ভালবাস—নিজের দেহ, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু। আর ভালবাস ইন্দ্রিয়ের যাহারা সেবক এবং ভোগের উপকরণ যাহারা দেয় তাহাদিগকে। পিতা, মাতা, পুত্র, স্ত্রী আত্মীয়কে। আমাকে —মাকে তোমরা ভালবাস না। কারণ আমি তোমাদের ভোগ্য বস্তু নহি। আমি যে তোমাদের দেহ মন ও ইন্দ্রিয়ের সাধ মিটাইতে পারি না। বরং বার বার বলি—আলেয়ার

পিছনে আর ছুটিও না। ভোগের শেষ নাই। উপকরণেরও সীমা নাই। যত পাও তত চাও। যত পাও তত জ্বালা। তাইত বার বার দগ্ধ হও, আর্ত্তনাদ কর। আমাকে বাদ দিয়া শুধু আমার দান নিয়া প্রমত্ত হও। দানের মধ্যে যে আমার কত স্নেহ ও করুণা রহিয়াছে তাহাও দেখ না। দান পাইয়া প্রমত্ত হও। আমাকে ভুলিয়া যাও। দানের মধ্যে, প্রদত্ত বস্তুর মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বার বার বলিতে থাকি—আমি স্তনভারনম্রা। স্নেহে বিগলিত হইয়া আমি আমার নিত্যধাম হইতে তোমাদের ভোগ্য সাজে সাজিয়া আসিয়াছি। আমি অন্নপূর্ণাই, অন্ন মূর্ত্তিতে তোমার ক্ষুধার অন্ন সাজিয়া আসিয়াছি। আমি যেমন তোমার পেটের ক্ষুধার অন্ন সাজিয়া আসি, তেমনি মনের ক্ষুধায় ধ্যান ও চিন্তারূপে আসি। আর প্রাণের ক্ষুধায় আসি মা হইয়া—মহাপ্রাণ হইয়া। আসি তোমার ক্ষুদ্র প্রাণকে আমার মহাপ্রাণে মিলাইয়া লইতে। তাইত আমাকে—মোক্ষদ্বার কপাটপাটনকরী বলিয়া ;—বিজ্ঞান-দীপাঙ্কুরী বলিয়া আমার প্রিয় পুত্রগণ বলে। মোক্ষলাভের দরজা আমিই খুলিয়া দিই। জ্ঞান-অঞ্জন আমিই নয়নে পরাইয়া দেই। তাই আমার বরপুত্রগণ লীলানাটক-সূত্রভেদনকরী বলিয়া আমাকে অর্চ্চনা করে।

তোমরা আমার দিকে তাকাও না। শুধু আমার দানের দিকেই তাকাও। তাইত' এত জ্বালা। এত দুঃখ এত হাহাকার। এত অন্নকষ্ট। এত বস্ত্রকষ্ট। এত বিলাপ। এত প্রলাপ। এত দুঃস্বপ্ন। চক্ষু খুলিয়া, হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া একবার আমার দিকে তাকাও। প্রতি ভোগ্য বস্তুর অন্তরালে আমার মঙ্গল হস্তকে দেখ। তোমাদের বেদনায়, তোমাদের আর্ত্তনাদে

আমিও বেদনা অনুভব করি। কিন্তু তোমাদের কাছে আসিবার পথ পাই না। উপকরণের পর উপকরণ সাজাইয়া গৃহের এক কোণেও আমার জন্য একটু স্থান রাখ না। বাসনার পর বাসনার ইন্ধন যোগাইয়া আমার জন্য মনের এক কোণেও বিন্দুমাত্র স্থান অবশিষ্ট রাখ না। আমি দ্বারে যাই, ফিরিয়া আসি। আবার আর্ত্তনাদ শুনি। আবার যাই। আবার ফিরিয়া আসি। তোমরা খেলায় প্রমত্ত হইয়াছ। উপকরণ নিয়াই মুগ্ধ হও। আঘাত পাও তবু ছাড়িতে পার না। একটু সুখ, একটু শান্তির লালসায় দূরে কতদূরে নামিয়া যাও। কামে ক্রোধে লোভে অহরহ হাবুডুবু খাও। আঘাত পাও। দগ্ধ হও। আর্ত্তনাদ কর।

প্রিয় পুত্রগণ, একবার নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী, সৌন্দর্য্য-রত্নাকরী আমার দিকে চক্ষু ফিরাও। রাজরাজেশ্বরীকে পাইলে, আনন্দময়ীকে পাইলে, অভয়া বরদা আমাকে পাইলে কোন উপকরণের অভাবই তোমাদের থাকিবে না। আমাতেই রহিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমাতেই রহিয়াছে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র। আমাতেই রহিয়াছে যত বৈভব। আর রহিয়াছে সুখ শান্তি অমৃত অভয়। দানের পিছনে ছুটিও না। যিনি দাতা তাঁহাকে দেখ। সকল দুঃখ ও দৈন্য দূর হইবে। ভিক্ষাং দেহি বলিয়া আর উপকরণ চাহিও না। একবার আমাকে চাও। আমার দিকে মা বলিয়া হাত বাড়াও। আর বার বার বল—কেবলানুভবানন্দ রূপেন পরমেশ্বরী ;

আবির্ভূয় পরং ব্রহ্ম, কুরু মাং মুক্ত বন্ধনম্।

॥ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা—১৩৭১।

পিছনে আর ছুটিও না। ভোগের শেষ নাই। উপকরণেরও সীমা নাই। যত পাও তত চাও। যত পাও তত জ্বালা। তাইত বার বার দগ্ধ হও, আর্ত্তনাদ কর। আমাকে বাদ দিয়া শুধু আমার দান নিয়া প্রমত্ত হও। দানের মধ্যে যে আমার কত স্নেহ ও করুণা রহিয়াছে তাহাও দেখ না। দান পাইয়া প্রমত্ত হও। আমাকে ভুলিয়া যাও। দানের মধ্যে, প্রদত্ত বস্তুর মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বার বার বলিতে থাকি—আমি স্তনভারনম্রা। স্নেহে বিগলিত হইয়া আমি আমার নিত্যধাম হইতে তোমাদের ভোগ্য সাজে সাজিয়া আসিয়াছি। আমি অন্নপূর্ণাই, অন্ন মূর্ত্তিতে তোমার ক্ষুধার অন্ন সাজিয়া আসিয়াছি। আমি যেমন তোমার পেটের ক্ষুধার অন্ন সাজিয়া আসি, তেমনি মনের ক্ষুধায় ধ্যান ও চিন্তারূপে আসি। আর প্রাণের ক্ষুধায় আসি মা হইয়া—মহাপ্রাণ হইয়া। আসি তোমার ক্ষুদ্র প্রাণকে আমার মহাপ্রাণে মিলাইয়া লইতে। তাইত আমাকে—মোক্ষদ্বার কপাটপাটনকরী বলিয়া ;—বিজ্ঞান-দীপাঙ্কুরী বলিয়া আমার প্রিয় পুত্রগণ বলে। মোক্ষলাভের দরজা আমিই খুলিয়া দিই। জ্ঞান-অঞ্জন আমিই নয়নে পরাইয়া দেই। তাই আমার বরপুত্রগণ লীলানাটক-সূত্রভেদনকরী বলিয়া আমাকে অর্চ্চনা করে।

তোমরা আমার দিকে তাকাও না। শুধু আমার দানের দিকেই তাকাও। তাইত' এত জ্বালা। এত দুঃখ এত হাহাকার। এত অন্নকষ্ট। এত বস্ত্রকষ্ট। এত বিলাপ। এত প্রলাপ। এত দুঃস্বপ্ন। চক্ষু খুলিয়া, হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া একবার আমার দিকে তাকাও। প্রতি ভোগ্য বস্তুর অন্তরালে আমার মঙ্গল হস্তকে দেখ। তোমাদের বেদনায়, তোমাদের আর্ত্তনাদে

আমিও বেদনা অনুভব করি। কিন্তু তোমাদের কাছে আসিবার পথ পাই না। উপকরণের পর উপকরণ সাজাইয়া গৃহের এক কোণেও আমার জন্য একটু স্থান রাখ না। বাসনার পর বাসনার ইন্ধন যোগাইয়া আমার জন্য মনের এক কোণেও বিন্দুমাত্র স্থান অবশিষ্ট রাখ না। আমি দ্বারে যাই, ফিরিয়া আসি। আবার আর্ত্তনাদ শুনি। আবার যাই। আবার ফিরিয়া আসি। তোমরা খেলায় প্রমত্ত হইয়াছ। উপকরণ নিয়াই মুগ্ধ হও। আঘাত পাও তবু ছাড়িতে পার না। একটু সুখ, একটু শান্তির লালসায় দূরে কতদূরে নামিয়া যাও। কামে ক্রোধে লোভে অহরহ হাবুডুবু খাও। আঘাত পাও। দগ্ধ হও। আর্ত্তনাদ কর।

প্রিয় পুত্রগণ, একবার নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী, সৌন্দর্য্য-রত্নাকরী আমার দিকে চক্ষু ফিরাও। রাজরাজেশ্বরীকে পাইলে, আনন্দময়ীকে পাইলে, অভয়া বরদা আমাকে পাইলে কোন উপকরণের অভাবই তোমাদের থাকিবে না। আমাতেই রহিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমাতেই রহিয়াছে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র। আমাতেই রহিয়াছে যত বৈভব। আর রহিয়াছে সুখ শান্তি অমৃত অভয়। দানের পিছনে ছুটিও না। যিনি দাতা তাঁহাকে দেখ। সকল দুঃখ ও দৈন্য দূর হইবে। ভিক্ষাং দেহি বলিয়া আর উপকরণ চাহিও না। একবার আমাকে চাও। আমার দিকে মা বলিয়া হাত বাড়াও। আর বার বার বল—কেবলানুভবানন্দ রূপেন পরমেশ্বরী ;

আবির্ভূয় পরং ব্রহ্ম, কুরু মাং মুক্ত বন্ধনম্।

॥ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা—১৩৭১।

ভগবানের সাথে মিলন ও বিরহ

কোন কোন সাধক বলেন—ভগবানের প্রাপ্তি অপেক্ষা তাঁহার জন্য বিরহের মূল্য বেশী। তাঁহারা আরও বলেন—মিলনে একস্থানে শুধু একা পাই প্রেমাস্পদকে। আর বিরহে তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়েন। উদাহরণ স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বিরহকে প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছিলেন—

"শ্রবণাদ্দর্শনাধ্যানাম্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥"

আমাকে পাওয়ায় জন্য তোমাদের মনে যদি নিতান্তই আবেগ জন্মিয়া থাকে তবে তাহা আমার অঙ্গ সংস্পর্শে ঘটিবে না। আমার বিষয়ে শ্রবণ দর্শন মনন ও আলাপন দ্বারাই ভাবের বেশী উদ্বেগ হইবে। আমাকে নিবিড় ভাবে পাইবে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার সান্নিধ্যে নিরন্তর থাকিলেও গভীরভাবে আমাকে পাইবে না। অতএব তোমরা গৃহে গমন কর।

কথাটি বড়ই সুন্দর। দেহবুদ্ধি সম্পন্ন জীব ভগবানকে দেহীরূপে লাভ করিতে চাহে। দেহে দেহে মিলন হইলেই—অর্থাৎ দেহের সান্নিধ্যে বসিয়া থাকিলেই ঠিক প্রাপ্তি হইল ইহা মনে করে। কোন দেবমূর্ত্তির চরণ বা অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সাধক নিজেকে সমধিক কৃতকৃত্য মনে করেন। গুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া চরণামৃত গ্রহণ করিয়া অনেকে নিজেকে ধন্য মনে করেন। বর্ত্তমানে এমন ভক্তও দেখা যায় যাহারা গুরুর

দেহের সান্নিধ্যে থাকাকেই পরম প্রাপ্তি মনে করে। কিন্তু হায় তাহা কতটুকু সময়ের জন্য? এ সকল ভাব বুদ্‌বুদের ন্যায় অন্তরে আসে আবার বিলীন হইয়া যায়। আত্মপ্রসাদ তাহাদের সাময়িক একটু লাভ হয় বটে কিন্তু একজন তপস্বীর কাছে এ সকল ভাবের মূল্য সিকি পয়সা মাত্র। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেহধারী রূপে পাইয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। এই আসক্তি সংস্পর্শ জনিত সুখলাভের আসক্তি। দেহের সঙ্গে দেহের মিলন হইলে সুখের উদ্বেগ হইবে তাই এই উত্তম পুরুষের সন্নিকর্ষ তাহাদের ভাল লাগিতেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

সংস্পর্শ জনিত সুখ ততক্ষণই পাওয়া যায় যতক্ষণ দেহের সংস্পর্শে থাকা যায়। কিন্তু দেহের সঙ্গে দেহের মিলন চিরস্থায়ী হইতে পারে না। দেহের ক্ষুধা আছে। তৃষ্ণা আছে। মলমূত্র ত্যাগ আছে। আরও কত কিছু দেহের ধর্ম্ম আছে তাই একজন দেহধারীর সঙ্গে অন্য একজন দেহধারীর মিলন স্থায়ী হয় না। নিবিড় হয় না। গভীর হয় না। আরও বলিয়াছেন—দেহের সঙ্গে দেহের মিলনে যে সুখ হয় তাহাতে পরিণামে ঘটে দুঃখ প্রাপ্তি। দেহের সঙ্গে দেহের মিলনে সাধারণতঃ মনের উর্দ্ধগতি না হইয়া নিম্নগতি হইয়া থাকে। প্রেম না হইয়া কাম হইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা, পিতাপুত্রের ভালবাসা, বন্ধু বন্ধুতে ভালবাসা, তাহাতে থাকে প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন ভাবে নানা কামনা। তাই ঋষি

মেধস বলিয়াছিলেন—'সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি লোভা প্রত্যুপকারায়।' গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দেহকে ভালবাসিয়াছিলেন অনেকটা কামাসক্ত হইয়া। তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার অভিলাষ জন্মিয়াছিল অনেক গোপীর অন্তরেই। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য গোপীরা কাত্যায়নী ব্রতও করিয়াছিলেন। গোপীদের মধ্যে একমাত্র রাধিকার অন্তরেই ছিল নিষ্কাম প্রেম। কিন্তু তাঁহাকেও যখন অগ্রাধিকার প্রদান করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার মনেও আসিয়াছিল অভিমান বা অহংকার। তাই তিনিও হারাইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে।

দেহের বা রূপের উপাসনার দ্বারা সাধকের অন্তর শুদ্ধ হয় যদি থাকে দেহের প্রতি নিষ্কাম শ্রদ্ধা ও প্রেম। কিন্তু অন্তরের শুদ্ধি লাভই তপস্বীদের চরম লক্ষ্য নহে। চরম লক্ষ্য হইল একান্ত ভাবে প্রেমাস্পদকে পাওয়া। এই পাওয়ার কথা নিয়াই সাধকদের মধ্যে রহিয়াছে নানা প্রকার মতবাদ। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই আমাদের মতদ্বৈধ ঘুচিয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রাপ্তির কথা বলিতে যাইয়া গীতায় বহুস্থানে তাঁহার স্বগুণ নির্গুণ, সাকার নিরাকার দুই রূপের কথাই বলিয়াছেন। প্রাপ্তির প্রথম অবস্থায় সাকার হইলেও পরিপূর্ণ প্রাপ্তি ঘটে তাঁহার নিরাকার বিরাট রূপকে পাইলেই। তিনি বিরাট, তিনি ভূমা, তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।

স্বরূপতঃ তিনি সূক্ষ্ম বলিয়াই তাঁহাকে এই স্থূল ইন্দ্রিয়বর্গ ধরিতে পারে না। তিনি নিকট হইতে নিকটে আবার দূর হইতেও দূরে রহিয়াছেন। এই চরম ও পরম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু দেখিবার কি উপায়; লাভ করিবার কি পথ সেই তত্ত্বকথা বলিতে যাইয়া তিনি গীতার দশম অধ্যায়ে ও বিভিন্ন

অধ্যায়ে তাঁহার তটস্থ লক্ষণ সম্বন্ধে বহুকথা বলিয়াছেন। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—

—কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্তোঽসি ভগবন্ ময়া।

আমি তোমাকে কিরূপে চিন্তা করিব, পাইব, সেই কথা বল। গীতার দশম অধ্যায়ে তিনি প্রতি বিশিষ্ট বস্তুকে তাঁহারই বিভূতিময় রূপ বলিয়া দেখিতে নির্দ্দেশ দিলেন। বলিলেন—যেখানে যেখানে বিশেষ গুণসম্পন্ন কোন বিশেষ বস্তুকে দেখিবে সেখানে আমিই সেই গুণসমন্বিত বস্তু আকারে আকারিত হইয়াছি এই ভাব নিয়া আমাকে দেখিবে। তারপর সাধকদের চিত্তের সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার জন্য আরও স্পষ্ট ভাবে বলিলেন—

—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

আমার একাংশে জগৎ স্থিত রহিয়াছে। অর্থাৎ জগতের এই অনন্ত রূপে রূপায়িত হইয়াও আমার নির্গুণত্বের ও বিরাটত্বের অপচয় হয় নাই। জগৎ আমার একাংশে মাত্র রহিয়াছে। আবার বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি বলিলেন—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। এই সমস্ত বিশ্ব চরাচর রূপে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ আমিই রহিয়াছি। আরও বলিলেন—

যা মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মেন প্রণশ্যতি ॥

যে আমাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে দেখে আমি তাহার নিকট অদৃশ্য হই না। আমি তাহাতে থাকি। সেও আমাতে থাকে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিলেন—এই যে আমার নরদেহ দেখিতেছ ইহাই. আমার অনন্তরূপ নহে। বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি। এই স্থূলদেহ ধারণ করিয়াও আমি বিরাট ভূমা। বিশ্বের অনন্ত রূপের সঙ্গে আমার এই বাসুদেব

মূর্ত্তিও আমার ভূমা সূক্ষ্মরূপের একাংশে অবস্থিত মাত্র। অতএব এই রূপের সান্নিধ্যে বসিয়া থাকিলেই আমাকে সম্যক পাওয়া হইবে না। রূপ অসীমেরই একটি স্ফুরণ মাত্র। আমাকে সর্ব্বত্র দেখ। মনন কর। ধ্যান কর। তত্ত্বতঃ আমাকে জান।

—ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্। আমাকে তত্ত্বত জানিতে জানিতে আমার ভক্তগণ আমার মধ্যে একান্তভাবে ডুবিয়া যায়। নিমজ্জিত হয়। আপন সত্তা হারায়। ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। ইহাই পরাভক্তির দ্বারা পরম অবস্থা প্রাপ্তি। ভগবান বলিলেন—আমাকে জানিয়া আমাকে দেখিয়া আমার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্ত গোপীগণকে উপদেশ দিলেন—তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। আমার দেহের সান্নিধ্যে এভাবে বসিয়া থাকিলে ধন্য হইবে না, কৃতকৃত্য হইবে না। ইহা বিরহের অশ্রুনীরে ভাসিবার জন্য উপদেশ নহে। তাঁহাকে চরম ও পরম ভাবে পাওয়ার উপদেশ। তিনি বলিলেন—আমার বিষয়ে শ্রবণ কর; মনন কর; ধ্যান কর। তবেই আমাকে পাইবে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ইহাই যোগের ক্রমবিকাশের পথ। শ্রবণ করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। তাঁহাকে লাভের জন্য অন্তরে তৃষ্ণা জাগে। শুধু লীলা কথা শ্রবণ নহে। তত্ত্ব কথাও শ্রবণ করিতে হইবে। প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে কিভাবে তিনি অবতীর্ণ হন;— আবার কিরূপে তিনি তাঁহার বিরাট মহান সত্তায় প্রবেশ করেন এ তত্ত্বকথাও জানিতে হইবে। শুধু রূপের কথা শুনিতে শুনিতে হঠাৎ ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে চলিবে না। রূপের

সঙ্গে গুণ। গুণে গুণে কত গভীর তত্ত্বের মধুর কথা। সেই তত্ত্বকে মনন করিতে হইবে। মননে হইবে মনের চঞ্চলতা ক্ষীণ। মন ক্ষীণ হইলেই হয় সত্তার সুস্পষ্ট অনুভূতি। তখনই হয় ধ্যান। প্রত্যয়ের একতানতা। তৈলধারাবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার চিন্ময়সত্তা প্রবাহিত হইতে থাকে অন্তর ও বাহির পরিব্যাপ্ত হইয়া। বাহির হয় অন্তর। বিশ্ব অন্তরেরই মূর্ত্ত ছবি ইহা অনুভবে আসে। সমাধিতে হয় অনন্তরূপের বিলীন। জীবত্বের বোধ হয় ক্ষীণ, জগং সংস্কার হয় বিলুপ্ত। প্রেমাস্পদ সমস্ত জীবন জুড়িয়া তাঁহার আসন পাতিয়া বসেন।

রূপের সাধনায় আমরা তাঁহাকে স্বীয় জীববোধের একপ্রান্তে একটু স্থান দেই মাত্র। জীবনের বৃহত্তর অংশ নিজের জন্যই পৃথক করিয়া রাখি। জীবনকে গর্ব্বিত আসনে রাখিয়া তাঁহাকে সম্যক রূপে পাওয়া হয় না।—মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। ধ্যানে ধ্যানে তাঁহাতে ধ্যানমগ্ন হইতে হইতে; প্রণামে প্রণামে তাঁহাকে প্রণতি জানাইতে জানাইতে জীবত্ব হয় ক্ষীণ। জীবত্ব যত ক্ষীণ হয় প্রেমময় তত ফুটিয়া উঠেন অন্তর ও বাহিরে। বিরহ নহে বেদনা নহে, পরম আনন্দ, পরম তৃপ্তি। তাই ভগবান তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে শুধু তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া থাকার জন্য প্রলুব্ধ না করিয়া অতি মধুর উপদেশ দিলেন—ওগো তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। শ্রবণ মনন, ধারণা ও ধ্যানের মধ্য দিয়া অহরহ আমাকে পাইবে। সমস্ত জীবন ভরিয়া আমাকে পাইবে। প্রতি অণুতে পরমাণুতে আমাকে পাইবে, শুধু আমাকেই পাইবে। শুধু আমাতেই হারাইবে। শুধু আমার মধ্যেই ডুবিয়া থাকিবে।

আরও বলিলেন—তোমাদের এই যে দেহ ইহাই তোমাদের

সর্ব্বস্ব নহে। এই দেহকে কেন্দ্র করিয়া রহিয়াছে এক বিরাট মন। ইন্দ্রিয়। এক ব্যাপক প্রাণ। এক অসীম বোধ। মন সূক্ষ্ম। প্রাণ সূক্ষ্ম। বোধ সূক্ষ্ম। ইন্দ্রিয়বর্গ মন প্রাণ বোধ যদি দেহকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় তবে দেহ শবে পরিণত হয়। তোমাদের দেহও একদিন শবে পরিণত হইবে। আমার দেহ আমি এই স্থূল জগতে ছাড়িয়া যাইব। দেহ অনিত্য। দেহী নিত্য। তাই তোমরা এই স্থূল দেহ ত্যাগ করিবে। এবং আমিও যে স্থূল দেহ ত্যাগ করিব তাহাতে আর আকৃষ্ট থাকিও না। মনে প্রাণে ও বোধে আমাকে মনন কর। আমাকে নিদিধ্যাসন কর। আমাকে ধ্যান কর। আমার মনের সঙ্গে মনকে মিলাও। আমার প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলাও। আমার বোধের সঙ্গে বোধকে মিলাও। দেহের সঙ্গে দেহের মিলনে ব্যবধান থাকে। মনের সঙ্গে মনের মিলনে ব্যবধান থাকে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলনে পুলকে অশ্রুতে মিলন সুধায় পরিপূর্ণ হয়। বোধের স্তরে বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে ধ্যানে হয় সতত তাহার সঙ্গে মিলন। সে মিলন নিবিড়। সে মিলন আরও গভীর। সাধক হারায় প্রেমাস্পদের প্রেমালিঙ্গনে নিজের সত্তা। প্রেমাস্পদ নিজেকে ঢালিয়া দেয় সাধকের মধ্যে অফুরন্ত ভাবে।

তাই ওগো বলি গৃহে ফিরিয়া যাও। আমাকে নিবিড় ও গভীরভাবে পাইবে। যে দেশে বিরহ নাই সে শান্তি রাজ্যে পৌঁছিবে।—যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা—১৩৭১।

মঠ-মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা ও প্যাগোডা

আজকাল দেশের কোন কোন সংবাদপত্র-সেবী এবং রাজনৈতিক নেতাগণ মন্দির এবং মসজিদকে তথা ধর্ম্মস্থানকে আক্রমণ করিয়া পরম আনন্দ ও গৌরব উপভোগ করেন। মনে ভাবেন তাঁহাদের এই আক্রমণ দেশবাসী অম্লান বদনে সহ্য করিয়া যাইতেছে ও যাইবে। কিন্তু অজ্ঞতারও একটা সীমা আছে। আক্রমণ করিবার মধ্যেও একটা শালীনতা ও শিষ্টাচার আছে। তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রেই ইহা লঙ্ঘন করেন। তাঁহারা ভাবেন বিরাট ঈশ্বরের জগতে তাঁহারাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং দেশের জনসাধারণকে পরিচালনা করিবার একমাত্র অধিকার তাঁহাদেরই আছে। গত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের স্বর্গীয় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদজী এক সময় বলিয়াছিলেন—ভারতের মন্দিরগুলি প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে স্থানে স্থানে ফোর্টের কাজ করিয়াছে। রাষ্ট্র-বিপ্লবিগণ পুলিসের ভয়ে যখন আত্মগোপন করিতেন তখন অনেক মঠে বা মন্দিরে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেন এবং দেশের সেবা করিতেন। স্বর্গীয় রাজেন্দ্র প্রসাদজী প্রভৃতিদের দৃষ্টিতে যাহা ছিল দেশ সেবকদের আশ্রয়স্থল ও উৎস তাহা হইয়াছে বর্ত্তমানের তথাকথিত নেতা ও সম্পাদকদের আক্রমণ স্থল। এক জাতীয় জীব আছে উহারা তুলসী গাছ দেখিলেই উহাতে মূত্র ত্যাগ করে। তুলসী গাছ অপেক্ষা ছোট বড় অনেক গাছই রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের

মূত্র ত্যাগ করিবার প্রধান স্থান হইল তুলসী গাছ। শুনিতে পাই তুলসীকে নাকি সীতাদেবী ও অন্যান্য কেহ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই এই জীবটি তুলসী গাছের উপর মূত্র ত্যাগ করে। জানি না হিন্দুর মঠ মন্দিরের উপরেও কাহারও এ জাতীয় অভিশাপ আছে কি না। মসজিদকে আক্রমণ করা তাহাদের তত লক্ষ্যস্থল নহে। প্রধান লক্ষ্যস্থল মন্দিরই। তবে মন্দিরকে গালি দিতে গেলে মসজিদকে ও অন্যান্য ধর্ম্মমন্দিরকেও কিছু বলিতে হয় তাই, মৃদু মধুর কণ্ঠে মসজিদকেও কিছু বলা হয়। ইহা হিন্দু জাতির এক চরম দুর্দ্দিন বলিতে হইবে। কিন্তু খৃষ্টানদের গির্জ্জা, বৌদ্ধদের প্যাগোডা শিখদের গুরুদ্বার প্রভৃতি নাম শুনিলে ইহারা তত ক্ষিপ্ত হন না, হইতে সাহসীও হন না। এমন কি করজোড়ে নমস্কারও করেন। খৃষ্টানরা যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে সভা সমিতি করেন তাহা হইলে রাষ্ট্রের কোন আপত্তি থাকে না। রাষ্ট্রপতি হইতে আরম্ভ করিয়া দলে দলে সকলেই তাহাদের আদর আপ্যায়ন জানান। বৌদ্ধদের ধর্ম্ম নিয়া ভারতে আন্দোলন কম হইতেছে না। স্বয়ং নেহেরুজী পর্যন্ত অনেকবার সেই উৎসবে মত্ত হইয়াছেন। যত আক্রমণ হয় হিন্দু, হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু মন্দিরের উপর। হিন্দু শব্দ উচ্চারণ করাও অনেকে বহুদিন হইতে ভারতে জঘন্য পাপ বলিয়া মনে করেন। মুসলিম ও ননমুসলিম এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে কতিপয় রাষ্ট্রনেতা ও কতক সংবাদপত্র সেবকদের জিহ্বাও হয়ত একেবারেই আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহারা হিন্দু জাতি ও ধর্ম্মের গুপ্ত শত্রু সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগকেও মনে রাখিতে হইবে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির মধ্যে যে সজীবতা

রহিয়াছে তাহা ইংরাজ মুসলমান প্রভৃতি বৈদেশিকগণও শত শত বৎসর অত্যাচার করিয়া নষ্ট করিতে পারে নাই; ম্লানও করিতে পারে নাই। এখনও তীর্থে তীর্থে, মন্দিরে মন্দিরে যায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রাণের আকুতি জানাইয়া দিব্য জীবন লাভের জন্য ও শান্তি পাওয়ার জন্য। আপনারা বলিতে পারেন কি মঠ ও মন্দিরগুলি শুধু দেশ ও জাতির অনিষ্টই করিতেছে? ইহার দ্বারা দেশ জাতির কোন্ কল্যাণই হইতেছে না?—কংগ্রেসীদের কংগ্রেস আফিস, কমিউনিষ্টদের আফিস বা আড্ডা বা অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের যে সকল আড্ডা রহিয়াছে উহা দ্বারাই কি শুধু দেশের ও জাতির উপকার হইতেছে? ইহারাই কি শুধু দলাদলি ত্যাগ করিয়া, স্বার্থগণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া দেশমাতৃকার সেবায় জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আত্ম ত্যাগ করিতেছেন?—নিশ্চয়ই নয়। তাঁহাদের মধ্যে আছে প্রবল দলাদলি, আছে গণ্ডী। আছে শ্লোগান, আছে গদী দখলের মোহ। ইহাদের শ্লোগান ও আদর্শ দেশের তরুণ সমাজকে উন্মার্গগামী করিতেছে। জন সাধারণকে বিভ্রান্তিকর পথে পরিচালিত করিতেছে। আমাদের কোন ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্মের মোহ নাই বলিয়া এক টেবিলে খানা খাইলেই চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও মনের অপবিত্রতা দূর হয় না। খেলার মাঠে বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়দের বিভিন্ন প্রকারের পোষাক থাকে। দেশে দেশে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন পতাকা আছে। সেইরূপ ধর্ম্ম পথের পথিকদেরও যদি পোষাকে একটু বৈচিত্র্য থাকে, ভিন্ন ভিন্ন পতাকা থাকে, ইহাতে ঘৃণা করিবার কি আছে? উপহাস করিবার কি আছে? পাদ্রী, পোপ,

২১

বৌদ্ধ ও স্যালভেশন আর্মিদের (Salvation Army) বিভিন্ন পোষাক থাকিতে পারিবে, আর পুরোহিত বা সাধু সন্ন্যাসীদের পোষাকের একটু বৈশিষ্ট্য দেখিলেই ঘৃণা করিতে হইবে ?

কংগ্রেসের নামে বৎসর বৎসর অরণ্যকে নগরে পরিণত করিয়া দেশের দরিদ্র জন-সাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকা তিন চার দিনের জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে উহাতে বাক্যাড়ম্বর ভিন্ন দেশের কল্যাণকর কাজ সামান্যই হয়। সম্পাদকদের কাগজে কাগজে কত আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ, কত আবেদন নিবেদন, কত প্রপ্যাগ্যাণ্ডা হইতে থাকে জনসাধারণকে এই আড়ম্বর পূর্ণ কংগ্রেস মণ্ডপে উপস্থিত করিবার জন্য। দেশের আকর্ষণে না আসিলেও স্বার্থের আকর্ষণে কয়েক সহস্র লোক তথায় আসে ভবিষ্যতের পথ উজ্জ্বল করিয়া লইবার জন্য। না আসিলে মন্ত্রী হওয়া দূরের কথা M. P বা M. L. A. হওয়ার সম্ভাবনাও কম। এমন কি দোকানদারী করিবার লাইসেন্সও মিলিবে না। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক বকধার্ম্মিক দেশের সেবার নামে ঐ বর্ণোজ্জ্বল প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেলের তলায় সমবেত হয়। সেই দলপতিগণেরও অধিকাংশ হিন্দুধর্ম্মের নামে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। তাহাদের দুর্ব্বল নীতির জন্য লজ্জাবোধ করেন না। রহিয়াছে নিজেদেরই মধ্যে পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য জঘন্য দলাদলি ও আত্মকলহ।

আপনারা দেখিয়াছেন কি ভারতের তীর্থে তীর্থে, কুম্ভ-মেলায়, গ্রহণের গঙ্গাস্নানে, লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ? তাহাদিগকে আহ্বান করিবার জন্য কোন সংবাদ পত্রের প্রয়োজন হয় না। কোন ধুরন্ধর রাষ্ট্রনেতারও প্রয়োজন হয় না। নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়া উজ্জ্বল আলো বসাইবার,

জলাসয় খনন করিবার বা অন্য কোন প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করিবারও প্রয়োজন হয় না। ঐ বেলা ভূমিতে, ঐ বৃক্ষতলায়, শীত গ্রীষ্মের সকল কষ্টকে অবহেলা করিয়া কত লক্ষপতি, কত কোটিপতি তীর্থস্থানে এখনও সমবেত হইতেছে? —দেখিয়াছেন কি তথায় কোন প্রকার চর্ব্ব্যচুষ্য লেহ্য পেয়ের কোন ব্যবস্থাই নাই? কেহ বা উপবাস থাকিয়া, কেহ বা সামান্য আহার্য্য গ্রহণ করিয়া প্রয়াগের এই গঙ্গাতটে পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়াছেন কি কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে ঘাটে স্নানার্থী লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধ বনিতার ভীড়। দেখিয়াছেন কি হরিদ্বারের অলিতে গলিতে গঙ্গাতটে লক্ষ লক্ষ নরমুণ্ড? দেখিয়াছেন কি যাহারা গৃহের সকল প্রকার সুখকে পদদলিত করিয়া একটু পূত, একটু পবিত্র হইবার জন্য ঐ গঙ্গায় অবগাহন করিবার জন্য শুভমূহূর্ত্ত গণনা করিতেছে? দেখিয়াছেন কি হিমালয়ের তুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ঐ কেদার বদ্রী অভিমুখে, সহস্র সহস্র লোককে অভিযান করিতে? দেখিয়াছেন কি গয়া, কাশী, বৃন্দাবন ও দাক্ষিণাত্যের বিরাট মন্দিরে দেবদর্শনের জন্য সম্বৎসরই ট্রেণগুলিতে কত লোক যাতায়াত করে? তাহারা গদী চাহে না। তাহারা হিংস্র বা ক্রূরও নহে। তাহাদের ধর্ম্মকে আক্রমণ না করিলে মানুষ দূরের কথা কুকুর বিড়ালকেও কিছু বলে না। বরং ধর্ম্মের নামে কুকুর বিড়ালেরও সেবা করে। মঠ ও মন্দির শিক্ষা দেয় তুঃস্থ জীবের সেবা করিতে। মঠ ও মন্দির শিক্ষা দেয় আর্ত্তকে সন্তনা দিতে; নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, অন্নহীনকে অন্ন দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, রোগীকে ঔষধ দিতে, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে। আরও শিক্ষা দেয় দেশপ্রেমে উদ্বোধিত হইতে। ভুলিয়া গিয়াছ

ঐ আনন্দমঠের শিক্ষা, যাহার জীবন্ত পূত মন্ত্র বন্দেমাতরম্ বলিতে বলিতে এখনও তোমার প্রাণহীন হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগে ? মন্দির ও মঠ বলে—যং বৈ ভূমা তং সুখম্। কানে দেয় অমৃতের বাণী। চোখে ধরিয়া দেয় দিব্যপথ। মনে তুলিয়া দেয় বিপুল উৎসাহের সঙ্গে পাথেয়। ইহাই হিন্দুর ধর্ম্ম। ইহাই হিন্দু মঠ ও মন্দিরের আদর্শ। হিন্দুর উপনিষদ্ বেদান্ত গীতা এই শিক্ষাই দিতেছে। কিন্তু ভারতের বাহির হইতে আগত যে সকল লোক ধর্ম্মের নামে ভারতের নারীর উপর অত্যাচার করিতেছে, ধন অপহরণ করিতেছে, গৃহদাহ করিতেছে, সেই আততায়ীর দলকে বলিবার মত হে কংগ্রেস, হে সম্পাদকমণ্ডলী, তোমাদের বুকে বল নাই। তথায় তোমরা মূক। তথায় তোমরা বধির। শুধু ভোট সংগ্রহের জন্য ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের পদচুম্বন কর। মঠ ও মন্দির কলহ শিখায় নাই। কিন্তু মনে রাখিও শত শত বৎসর যে জাতি অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছে, যে জাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নষ্ট করিয়া এক নূতন জঘন্য ভাবের সমাবেশে নূতন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-পূর্ণ ভারতীয় সভ্যতা তোমরা স্থাপন করিতে চাহিতেছ তাহা ভারতীয় সমাজ জীবনকে নষ্টই করিবে। ভারতের কৃষ্টি ভারতের সভ্যতা, ভারতের বেদবেদান্ত মন্দিরকে আশ্রয় করিয়া চিরদিন পৃথিবীকে যেমন শুনাইয়াছে অমৃতের অভয় বাণী, তেমনি শুনাইয়াছে—'দৈত্যানাং দেহনাশায়' আমি আসি পৃথিবীর বুকে "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।" সে ভগবৎ মহিমার রহস্য বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের এখনও হয় নাই। 'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।' তাহার সৃষ্টিতে কালের কুটিল কটাক্ষে তোমরা কিছু রাষ্ট্র ধুরন্ধর হিন্দুধর্ম্মের বিদ্রোহী হইয়াছ। কিন্তু তোমরা চিরস্থায়ী নহ। তোমাদের বাণীও চিরস্থায়ী নহে। দুর্ব্বার

স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছ তোমরা, সমুদ্রে হবে হারা। পানা পুকুরের পানার ন্যায় স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে তাহারা। নদী তীরস্থিত মলমূত্রের ন্যায় ভাসিয়া আসিয়াছে তাহারা। ভারতীয় সভ্যতাকে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে ইহারা মলিন করিয়া রাখিতে পারিবে না। খরস্রোতা ভারতীয় সভ্যতা তাহার সাবলীল প্রবাহে উহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আবার আসিবে নূতন স্রোত। আবার আসিবে তরুণের দল। আবার আসিবে একনিষ্ঠ ভক্ত ও সাধকের দল। দূর হইবে আততায়ীর দল। দূর হইবে ধর্ম্ম বিদ্রোহীর দল। দূর হইবে শুম্ভ নিশুম্ভের দল। দূর হইবে দেশের অন্নকষ্ট। দূর হইবে দেশের হাহাকার। আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারত তাহার স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই দিন বেশী দূর নহে।

স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসহীন রাজনীতিজ্ঞ তোমরা, চাহিয়া দেখ একমাত্র হিন্দু তোমরা ভিন্ন অন্য কোন জাতি, দেশ বা ধর্ম্মী তাহাদের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই। ধর্ম্মদ্রোহীও হয় নাই। এখনও কমনওয়েলথ্ ভুক্ত তোমাদের রাষ্ট্রে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ আসিয়া গির্জায় যাইয়া প্রার্থনা করেন। এখনও সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিসেস বন্দরনায়ক ভারতে আসিয়া বৌদ্ধ মন্দিরে যাইয়া উপাসনা করেন। এখনও বিভিন্ন ইসলাম রাজ্যের মন্ত্রীগণ আসিয়া দিল্লীর জুম্মা মসজিদে যান, নামাজ পড়েন এবং স্বধর্ম্ম স্বজাতিকে নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। শুধু তোমরাই ধর্ম্ম হারাইয়াছ। তাই নীতিও হারাইয়াছ। তাই দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ পাপ প্রবেশ করিয়াছে। দেশের মুখ্যমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নস্তরের কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত দুইহাতে দস্যুর ন্যায় সর্ব্বসাধারণের অর্থ শোষণ

করিতেছে। চোরা কারবারীগণ ভয় ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া জনসাধারণের আহার্য্য বস্তু নিয়াও জুয়া খেলিতেছে। তজ্জন্য দায়ী আর কেহ নহে। প্রধান দায়ী তোমরা—ঐ রাষ্ট্র ধুরন্ধরগণ ও সংবাদপত্র সেবীগণ। তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ কর।

। ওঁ শান্তিঃ হরি ওঁ ।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা—১৩৭১।

রথে বামন দর্শন

রথে বামন দেবতাকে দর্শন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। "—রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" সেই রথ দেখিবার জন্য লোক নানা স্থানে ছুটিয়া যায়। কিন্তু হায় সে জানে না আত্মজ্ঞ ঋষিগণ পুনঃ পুনঃই বলিয়া গিয়াছেন—এই শরীরই রথ। আত্মাই রথী। এই দেহরূপ রথে আত্মা বামন আকারে ত্রিপাদভূমি দখল করিয়া রহিয়াছেন। মূলাধার, অনাহত ও সহস্রার এই তিন ভূমিতে বামনের ত্রিপাদ রহিয়াছে। মূলাধারে মন, অনাহতে প্রাণ, সদস্রারে জ্ঞান। মূলাধারে ব্রহ্মা, অনাহতে বিষ্ণু ও সহস্রারে শিব। এই তিন মূর্ত্তিতে তাঁহার ত্রিপাদের অভিব্যক্তি। মনের স্তরে হয় প্রজনন বা সৃষ্টি। প্রাণের স্তরে হয় সম্ভোগ। আর জ্ঞানের স্তরে হয় সমস্ত নাম রূপের বিলয় এবং বিরাট সত্তার অনুভূতি। বলি রাজার নিকট—অর্থাৎ দেহরূপ পুরের রাজা যখন নিজেকে বলি দিতে ইচ্ছা করেন, উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি

হন বলিরাজা। দেহরূপ পুরের—রাজ্যের রাজা হইয়া বসিয়া রহিয়াছে এক অহং। এই অহং বা জীববোধ যখন নিজেকে উৎসর্গ করিতে—নিবেদন করিতে,—শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে অভিলাষী হন, তখনই তিনি হন বামন দেবের উপাসক। অহং প্রথম বুঝিতে পারে না এই দেহরূপ পুরের অধিপতি আমি নই। যতক্ষণ আমি দেহপুরের অধিপতি ততক্ষণই জন্মমৃত্যুর ঘাত-প্রতিঘাত বার বার আসে। কিন্তু এই দেহপুরকে যদি বামনদেবের নিকট বলি দিতে পারি, উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। ইহাই সাধনার গুহ্য রহস্য। তাই ধ্যান নিবিষ্ট যোগী অহংকে বলি দিতে চাহে ঐ বামনদেবের নিকট। বামনদেবের ত্রিপাদ ভূমি চাই। তাঁহাকে মন দিতে হইবে। প্রাণ দিতে হইবে। জ্ঞান দিতে হইবে। মনের স্তরে থাকে বিজাতীয় ভেদ, স্বজাতীয় ভেদ ও স্বগত ভেদ। তাই তথায় অহরহ সৃষ্টির উন্মাদনা থাকে। প্রাণের স্তরে আসিয়া সাধক অনুভব করে —"প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং," সমস্তই প্রাণের বশ। এখানে বিজাতীয় ভেদ নাই। স্বজাতীয় ভেদ ক্ষীণাকারে থাকে। শুধু থাকে স্বগত ভেদ। ইহা ভোগময় ক্ষেত্র। যেখানে বহু ভেদ সেখানে ঠিক সম্ভোগ হয় না। ভেদে আকাঙ্ক্ষা বড়ায়। তৃপ্তি দেয় না। সম্ভোগ দেয় তৃপ্তি। ভোগ্য বস্তু যদি ভোক্তার সাথে মিশিয়া না যায় তাহা হইলে ঠিক সম্ভোগ হয় না। চিনিকে সম্ভোগ তখনই করা হয়, যখন চিনি আস্বাদিত হইতে হইতে ভোক্তার সঙ্গে মিশিয়া যায়। মিলাইয়া যাইবার জন্যই সম্ভোগ। যেখানে পৃথকবোধ আছে সেখানে সৃষ্টি আছে, প্রজনন আছে। ভোগেতে পৃথকবোধ ভোক্তার

সঙ্গে মিশিয়া যায়। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগের হয় ত্রিপুটি ভাব। অনাহত—হৃদয় এই ভোগময় ক্ষেত্র। বিষ্ণু এখানে ক্ষিরোদ সাগরে অর্থাৎ হৃদয় সাগরে চিরশায়িত। লক্ষ্মী পদসেবায় নিরত। এই হৃদয় সমুদ্রে ভাবের খেলা প্রেমের খেলা। ভক্ত এখানে দেখে বামনদেবের দ্বিতীয় পাদ। কোন ভোগ্য বস্তুই দূরে নহে। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত বৈভব, সমস্ত গুন ও মহিমা এই পদসেবায় নিরত। তাই লক্ষ্মী দেবীকে অর্থাৎ শ্রী ও সম্পদকে প্রাণের পদসেবায় নিরত দেখিতে পাই। মনের উদ্ভব এই প্রাণেরই নাভিকমল হইতে। অর্থাৎ নাভি হইতে —মণিপুর হইতে সাধিষ্ঠান ও মূলাধার পর্য্যন্ত মনের ভূমি। প্রাণে থাকে ত্রিপুটিভাব। তিনিই ভোক্তা তিনিই ভোগ। এক আনন্দময় ভাবের অনুভূতি। মনের স্তরে এই অনুভূতি থাকে না। দ্রষ্টার সঙ্গে হয় দৃশ্যের বিজাতীয় ভেদ প্রতীতি। যে সাধক নিজেকে বলি দিতে যাইয়া অর্থাৎ নিবেদন করিতে যাইয়া প্রথম পাদ মণিপুর হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত বামনদেবেরই পাদ বলিয়া অনুভব করিতে পারেন তিনিই আরও উর্দ্ধে উঠিয়া অনাহত ও কণ্ঠে অনুভব করেন বামনদেবের দ্বিতীয় পাদকে। কিন্তু বামনদেব যে ত্রিপাদ ভূমিই চাহিয়াছিলেন বলি রাজার নিকট। সহস্রারকেও ;—প্রজ্ঞাভূমিকেও এই বামনদেবকে দিতে হইবে। অহংকে পরিশুদ্ধ করিয়া—অর্থাৎ ভাবসাগরে অবগাহন করাইয়া সহস্রারে বসাইয়া রাখিলে চলিবে না। এই তৃতীয় ভূমিও বামনকে দান করিতে হইবে নিস্পৃহ হইয়া। অহং একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবে। দেখা তখনই ঠিক দেখা হয় যখন দর্শক তাহার আরাধ্যের সঙ্গে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। তাই শাস্ত্রকারগণ বলেন—প্রথম শুন। তারপর দেখ। তারপর

প্রবেশ কর। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। শ্রীভগবান সাধক অর্জ্জুনকে আরও বলিয়াছেন—ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।—হে অর্জ্জুন! আমাকে তত্ত্বত জানিতে জানিতে আমাতে প্রবেশ করিতে করিতে আমার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে হইবে। হৃদয় সমুদ্রে নানাভাবে তাঁহাকে সাধক ভোগ করে, জানে, দেখে। আর সহস্রারে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হয়। থাকে এক বিশুদ্ধ সত্তা। যাহা চির চিরচেতন। যাহা চির আনন্দময়। সত্তাবোধের অনুভূতি দেয় চেতনা ও আনন্দ। সহস্রারে এই চিন্ময় সত্তা চির আনন্দ রসে পরিপূর্ণ। তাই যোগীগণ বলেন—সহস্রার হইতে অমৃতধারা সতত বর্ষিত হইতেছে। হঠযোগীগণ জিহ্বা উল্‌টাইয়া সহস্রার হইতে এই ক্ষীরধারা আস্বাদনের প্রয়াসী হয়। ছেলেবেলায় আমিও এক হঠযোগীর নিকট হইতে এইরূপ অমৃতধারা আস্বাদনের উপদেশ পাইয়া-ছিলাম। কিন্তু হায় সে অজ্ঞ হঠযোগী জানে না—জিহ্বা অর্থাৎ লালসাকে উর্দ্ধগামী না করিলে বিরাট চিন্ময় সত্তার অহরহ যে ক্ষরণ হইতেছে জীবচেতনা ও বিশ্বচেতনার মধ্যে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই সহস্রারের ক্ষীরধারার অনুভূতি লাভ করিয়াই আত্মজ্ঞ ঋষিগণ বলিয়াছেন—আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।—আনন্দময় পুরুষ বামনদেবের তৃতীয় পাদ এইখানে। তাঁহার একাংশে অর্থাৎ চতুর্থ পাদের মধ্যে এক পাদে অনন্ত নাম রূপ এবং অনন্ত জগৎ। আর দেহরূপ রথের তিন ভূমিতে ত্রিপাদ গোপনে সংস্থাপিত। এই দেহরূপ রথের রাজা অহং যেদিন নিজেকে বলি দিতে চাহে সেইদিনই

বামনকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিতে উদ্যত হয়। এই ত্রিপাদ ভূমিতে বামনকে দেখিতে হইবে।—মনে, প্রাণে জ্ঞানে। মূলাধারে, অনাহতে ও সহস্রারে। উপনিষদের ঋষি শরীরকে রথ বলিয়াছেন। আত্মাকে বলিয়াছেন রথী। এই আত্মাই বামন। ইন্দ্রিয়বর্গকে বলিয়াছেন ঘোড়া। মনকে লাগাম। বুদ্ধিকে সারথী। বিষয় বিচরণ ভূমি। এই বিষয়রূপ বিচরণ ভূমি হইতে অর্থাৎ নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ হইতে ইন্দ্রিয় বর্গকে রথীর কাছে নিয়া যাইতে হইবে। যুগ যুগান্তর, লোক লোকান্তর, এই ইন্দ্রিয়বর্গ অর্থাৎ ঘোড়াসকল কত রথীকে টানিয়াছে। কতবার জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে। কিন্তু রথীকে দেখে নাই। বামনকে দেখে নাই। এইবার বুদ্ধি লাগামকে—মনকে সংযত করিয়াছে। ইন্দ্রিয়বর্গ এবার বামনকে দেখিবে। অহং রূপ বলি আজ তাহার ঘোড়াসকল বামনদেবের চরণে উৎসর্গ করিবে। এই ঘোড়াসকল এবং এই মন ও বুদ্ধি একবার বামনদেবকে দেহরূপ রথে দেখিলে আর বাহিরে ছুটিয়া যাইবে না। তাই তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। কবিগুরু তাই বলিয়াছেন—

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধূমধাম—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে—করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি'
মূর্ত্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী।

ওগো, বাহিরের রথ বহু জন্ম দেখিয়াছ। অথচ তোমার এই নিকটের রথীকে দেখিলে না। তোমার জীবন রথের রথী নিয়ত যে তোমারই রথের সন্নিকটে রহিয়াছেন। তিনি শুধু তোমার ত্রিপাদ ভূমি চাহিতেছেন। তুমি তোমার পুত্র

কন্যাকে, কত প্রিয়জনকে কত উপকরণ দিতেছ। নিজেকে তিলে তিলে বিলাইয়া দিতেছ। কিন্তু তাহাদের কেহই প্রসন্নতার হাসি হাসিয়া তৃপ্ত হইয়া বলে না আমি তৃপ্ত হইয়াছি। একবার এই বামনদেবের দিকে তাকাও। তিনি যে অতি দাতা, তোমার দ্বারে নিত্য বামন আকারে ভিখারীর বেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তিনি যে তোমার নিকট চর্ব্বচোষ্য লেহ্য পেয় কিছুই চাহেন না। তিনি চাহেন শুধু ত্রিপাদ ভূমি। ওগো যোগী! ওগো সাধক! এই ত্রিপাদ ভূমি বামনদেবকে অর্পণ করিয়া;—তুমি তোমার অহংকে বলি দিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাও। তাহা হইলেই আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। চিরশান্তি, চির আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা—১৩৭২।

আমার দুর্গাপূজা

মাটীর প্রতিমা গড়িয়াও আমি পূজা করি চিন্ময়ী দুর্গার। আমি পুতুলের পূজা করি না। পূজা করি পুতুলে প্রতিষ্ঠিত প্রাণময়ী দুর্গার। যাহাদের মনের কালি ও চোখের ছানি দূর হয় নাই তাহারা চিন্ময়ী মাকে দেখিতে পায় না। দেখে না বরাভয়দাত্রীকে—দনুজদলনীকে। আমি যে আমার বরদা, জ্ঞানদা, অভয়া, দুর্গতিহরা দুর্গাকে চিন্ময়ীরূপে দেখি ঐ মৃন্ময়ীর মধ্যে। ঐ মৃন্ময়ী দশভূজা দুর্গা হয় চিন্ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী প্রাণময়ী

আমার আকুল প্রার্থনায়। তাইত আমার দুর্গাপূজা প্রতিদিনই সার্থক হয়—শুধু মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ীরূপে দেখিয়া নয়, আমার হৃদয় পদ্মে ও দেহের অণুতে অণুতে দুর্গাকে—চিন্ময়ীকে দেখিয়া। তাই'ত আমার দুর্গাপূজা প্রতি তিথিতে তিথিতে সার্থক হয় মনের ও ইন্দ্রিয়বর্গের প্রতি ছন্দে ছন্দে চিন্ময়ীকে অনুভব করিয়া। আমার দুর্গাপূজা প্রতিদিনই সার্থক হয় যদি দেখি আমার প্রতি বোধের স্তরে স্তরে, নামে রূপে, গানে ছন্দে আমার দুর্গাকে—চিন্ময়ী মাকে। আমার প্রতি ঘটাই সার্থক হয় যখন দেখি আসন পাদ্য অর্ঘ্য রূপে সাজিয়া রহিয়াছেন এই চিন্ময়ী দুর্গা। আমার প্রতি মুহূর্ত্তই সার্থক হয় যদি অনুভব করি অর্ঘ্য দিতে যাইয়া আমার জীবনকে—জীববোধকে—আমার অহংকে দুর্গারূপিণী চিন্ময় মহাসমুদ্রেরই একটি ক্ষুদ্র বুদবুদ রূপে। দুর্গা বলিতে বলিতে যদি চিংসমুদ্রে ক্ষুদ্র বোধটি নিবেদন করিতে পারি, ঢালিয়া দিতে পারি, তবেই না আমার দুর্গাপূজা সার্থক হয়। আমার দুর্গা বলা, মা বলা তখনই সার্থক বলিয়া বোধ করি যখন মধুপর্ক নিবেদন করিতে যাইয়া, পঞ্চামৃত নিবেদন করিতে যাইয়া, আমার অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চ কোষকে চিন্ময়ী দুর্গারই লীলাবিলাসরূপে অনুভব করিতে পারি। অনুভব করিতে পারি আমার পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে চিন্ময়ী দুর্গাই সাজিয়া রহিয়াছেন। আবার দুর্গাই আমার ক্ষুদ্র অহংরূপে এই পঞ্চামৃতের সঙ্গে জড়াইয়া নানা প্রকারের রস আস্বাদনের জন্য তাহাকে লেহন করিতেছেন, চর্ব্বন করিতেছেন, অদন করিতেছেন। আমি আমার দুর্গাকে যখন চিন্ময়ীরূপে, ঈশ্বরীরূপে দেখি না তখনই

হারাই হারাই বলিয়া আর্ত্তনাদ করি। মৃত্যু আসিয়া ঘিরিয়া ধরে। রোগ শোক দুঃখ দৈন্য বিদ্রূপের হাসি হাসে। অমৃতের সাগরে দেখি হলাহলের বিকটমূর্ত্তি। তাই আমি দুর্গানাম ছাড়ি না। দুর্গানাম ভুলি না। দুর্গাকে চোখের অন্তরাল করি না। দুর্গা যে আমার চোখের জ্যোতি। দুর্গা যে আমার অন্তরের তৃপ্তি। দুর্গা আমার জপের মালা। দুর্গা আমার ধ্যান, দুর্গা আমার ধ্যেয়, দুর্গা আমার ধ্যাতা। আমার জীবনে দুর্গা,—আমার মরণে দুর্গা। আমার ভাবে দুর্গা, আমার অভাবে দুর্গা। পূজার উপকরণ সংগ্রহে দুর্গা,—পূজার উপকরণ রূপে দুর্গা। সম্মুখের বেদীতে আসিয়া দাঁড়ায় আমার দনুজদলনী, দুর্গতিহরা ঈশ্বরী দুর্গা। হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে দুর্গা,—সহস্রারে দুর্গা। দুর্গা কণ্ঠে, ললাটে, মূলাধারে, মণিপুরে, স্বাধিষ্ঠানে। সুষুম্না পথে শিহরণ দিতে দিতে মূলাধার হইতে সহস্রারে মনকে বহন করিয়া লইয়া যায় আমার এই সুখদা মোক্ষদা দুর্গা। দেহের অণুতে অণুতে সুখের প্রস্রবণ বহিতে থাকে। আমার দুর্গাপূজা সেদিন সার্থক হয় যেদিন দুর্গাকে অষ্টকলসীর জলে অভিষেক করিতে করিতে বাহিরের দুর্গাকে অন্তর রাজ্যে বসাইয়া চোখের জলে, ভাবের বন্যায় অভিষিক্ত করিতে পারি। আর দুর্গা আমার শিশু কন্যাটি হইয়া দহর আকাশ আলোকিত করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে আসিয়া বসেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে আমি আমার অন্তরের ভাবসমুদ্র হইতে কলসী কলসী ভাববারি উঠাইয়া তাঁহার শিরে ঢালি। তাঁহার শিরে ঢালি—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঢালি,—চরণে ঢালি, বক্ষে ঢালি, কপালে কপোলে, অধরে অম্বরে সর্ব্বত্র ঢালি। ঢালি দুর্গাকে, দুর্গারই শিরে। ঢালি প্রেমবারি প্রেমময়ীরই সহস্র শিরে।

তাঁহার যে সহস্র শির। তাঁহার যে সহস্র চরণ। তাঁহার যে সহস্র চক্ষু। ওগো দুর্গা আমার কলসীর বারি। আমার হৃদয় কুম্ভে দুর্গা রচনা করে সুধার সমুদ্র। হৃদয় পরিপূর্ণ করে হৃদয় পদ্মেরই সুগন্ধি পদ্ম রেণুতে। সেই হৃদয় কুম্ভকে ঢালিয়া অভিষিক্ত করি আমার সুধাময়ীকে আমার প্রেমময়ী দুর্গাকে ; আমার এই পরম আত্মীয়াকে, পরম বান্ধবকে। আমি ঢালি, আরও ঢালি। আমার ভাবসমুদ্রে অমৃতময়ী দুর্গাকে অভিষিক্ত করিতে করিতে মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করি। শোক দূরে যায়। ক্ষোভ দূরে যায়। আনন্দের উৎস বহিয়া যায়। আমার দুর্গাপূজা সেদিনই সার্থক হয় যেদিন অম্বর রূপিণী, আকাশ রূপিণী বিরাট দুর্গাকে, হৃদয় আকাশে, চিত্তাকাশে ও ভূতাকাশে দেখিতে দেখিতে, পাইতে পাইতে আমার অহংরূপী অম্বর দ্বারা—আচ্ছাদন দ্বারা আর তাঁহাকে আবৃত করিতে পারি না। সে উলঙ্গিনী হইয়া, দিগম্বরী হইয়া অম্বরে অম্বরে ঘুরিয়া বেড়ায় তড়িৎ বেগে। তাঁহার আস্যে লাস্যে কি মাধুরিমা বিস্তার করে। হাসে আমার দুর্গা ;—হাসে আমার কন্যা। বলে অম্বর আমার ভূষণ। দিগম্বরী আমি। যুগ যুগ ধরিয়া কেহ আবরণ দিয়া ঢাকিতে পারে নাই—আমাকে—দুর্গাকে। অম্বর ফেলিয়া দিই তখন দিগম্বরীর চরণ ধূলায়। আমার দুর্গাপূজা সেদিনই সার্থক হয়—যেদিন অনুরাগের অনুলেপে তাঁহাকে বিভূষিত করিতে করিতে আমার আমি অশ্রুগঙ্গা বর্ষণে বিগলিত হইয়া যায়। অহং গলিত না হইলে অনুলেপ রচনা হয় না। অশ্রুগঙ্গায়—শুধু গঙ্গা নহে গঙ্গা ও যমুনার দুই ধারায় আমার অহংরূপী জীববোধ যখন দুর্গারূপী প্রজ্ঞাকে কর্ত্তা ও প্রভু বলিয়া, ভর্ত্তা ও সাক্ষী বলিয়া গভীর

অনুরাগ ভরে মানিয়া লয় সেইদিনই হয় আমার যথার্থ অনুলেপ অর্পণ। ইহাই'ত আবার ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন। আমার দুর্গা বলা সেদিনই সার্থক হয় যেদিন ত্রিপুটি রূপ বিল্বপত্র ও সহস্রদল কমলকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দুর্গা বলিতে বলিতে সহস্রারে অধিষ্ঠিত আমার চিন্ময়ী দুর্গাকেই এক অখণ্ড চিন্ময় সত্তারূপে অনুভব করিতে পারি, আর মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি—গৃহাণ হৃদয়াঞ্জলি। হৃদয়ের প্রতি দলে দলে; সহস্রারের প্রতি দলে দলে দুর্গা নাম লিখিয়া,—দুর্গাভাবের অনুরাগ মাখাইয়া সহস্রলোচনা দুর্গার চরণে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারি। আমার দুর্গাপূজা সেদিনই সার্থক হয়—যেদিন আমার অসংখ্য জন্মের অসংখ্য সংস্কাররাশিতে দুর্গানাম লিখিয়া দুর্গারই কণ্ঠে পরাইয়া দিতে পারি। আমার দুর্গা বলা সেদিনই সার্থক হয় যেদিন আমার কর্মেন্দ্রিয়গণ বৈরাগ্যের অনলে দগ্ধ হইতে হইতে দুর্গাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া আরতি করিতে থাকে। দীপ রূপে দিই আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও আমার প্রত্যয়কে। সে প্রত্যয়ের শুদ্ধ শিখায় আসিয়া আমার দুর্গা নিষ্কম্প হইয়া অধিষ্ঠিত হন। যোগীগণ তাইত বলেন—শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্য আমার শুদ্ধ —বিশুদ্ধ দুর্গা, আমার নিষ্কলা দুর্গা, আমার শান্তিময়ী দুর্গা প্রত্যয়ের পরপারে অধিষ্ঠিত হইলেও প্রত্যয়ানুপশ্য। প্রজ্ঞারূপ দীপ শিখায় প্রত্যয়রূপ বিশুদ্ধ বোধ শিখার পরপার হইতে আমার দুর্গা আসিয়া নির্বিকল্প রূপে অধিষ্ঠিত হন। তখনই পরিপূর্ণ ও সার্থক হয় আমার দুর্গাপূজা। সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠে আমার জীবনের সহস্র গুহায় বিশুদ্ধ প্রজ্ঞারূপিণী দুর্গা। তখন দুর্গা থাকিলে আমি থাকি না। আমি থাকিলে দুর্গা থাকে না। দুর্গাই থাকে, শুধু দুর্গাই থাকে। আমার আমি

নিঃশেষে হারায়। আমার আমি নিঃশেষে বিলীন হয়। আমি চির নিদ্রিত হই। আমি চির সমাহিত হই। আমি চিরজাগ্রত হই। আমি আমার আমিকে হারাই। আমি আমার মাকে পাই,—দুর্গাকে পাই। এমনি ভাবে বর্ষে বর্ষে, এমনি ভাবে মাসে মাসে, এমনি ভাবে দিনে দিনে আমি আমার দুর্গাকে পাই। আমার অভয়াকে পাই। আমার সান্ত্বনাকে পাই। আমার শান্তকে পাই। তাই'ত আমি দুর্গাপুজা করি। তাই'ত আমি দুর্গা দুর্গা বলিয়া ডাকি। তাই'ত আমি দুর্গা দুর্গা বলিয়া হাসি। তাই'ত আমি দুর্গা বলিয়া কাঁদি। আমি দুর্গার কোলে বসিয়া দুর্গার সঙ্গে খেলি। আমি দুর্গার বুকে বসিয়া শুধু দুর্গাকেই দেখি, ভোগ করি, স্পর্শ করি, আলিঙ্গন করি। আমি দুর্গার বুক জোড়া ধন। আমি দুর্গার। দুর্গা আমার। দুর্গা আমার। দুর্গা আমার।

নমো নমস্তে; নমো নমস্তে; নমো নমস্তে।—তোমাতে আমার নমস্কার হউক। তোমাতে আমার চিরতরে নমস্কার হউক! আমার দুর্গা বলা তবেই সার্থক হইবে।

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥
ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা—১৩৭২।

বন্দে ভারতমাতরং

এই দুর্দ্দিনে মাকে আবার জাগাইতে হইবে।

আবার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সুরে সুর মিলাইয়া দেশের তরুণগণ উদাত্তকণ্ঠে গাহিয়া উঠিবে—

"দ্বাত্রিংশ কোটী খরকর বালে
অবলা কেন মা এত বলে !"

মা—তোমার এত বলবান পুত্র থাকিতেও তুমি অবলা কে বলিবে ? বহু বীর সন্তান এখনও তোমার বক্ষের স্তন্য পান করিতেছে। তোমার নদী তাহাদিগকে সুমিষ্ট জল দিতেছে, তোমার ভূমি শস্য দিতেছে, তোমার বৃক্ষ সুশীতল ছায়া ও সুমিষ্ট ফল দিতেছে, তোমার সুশীতল বাতাস অঙ্গের দাবদাহ শীতল করিয়া দিতেছে। তোমার আকাশ কোমল স্পর্শে ক্ষত স্থানে হাত বুলাইয়া দিতেছে। তোমার সন্তানগণ হীন-বীর্য নহে।

"আমরা ঘুচাব, মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

মা—তুমি আবার আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দাও, সেই বুদ্ধির প্রেরণায় আমরা আমাদের পথ নিশ্চয় করিয়া লইব এবং সেই পথে শত্রুকুলকে বাধা দিয়া, ধ্বংস করিয়া তোমার আসন জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিব। যার বুকে এখন চল্লিশ কোটী সন্তান,—তাহাদের মা আবার দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পদানত হইবে, শৃঙ্খলিত হইবে ?

আত্মজ্ঞ ঋষি ব্রহ্মর্ষি সত্যদেবের পথ অনুসরণ করিয়া আজ আমরা পুনরায়, হে ভারত জননী—তোমারই পাদমূলে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দাও।

"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"

"মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব
শ্রিয়শ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি নঃ॥"

"শত্রুনাং বুদ্ধি নাশায়—
শত্রুনাং বৃদ্ধি নাশায়—
উত্তিষ্ঠ মাতঃ স্বগুণৈঃ মহিম্না
পুত্রান্ প্রবুদ্ধান্ কুরু নিজ শক্ত্যা॥"

আবার তুমি উঠ, সিংহ বিক্রমে জাগিয়া উঠ, আবার তুমি অমোঘ ডাক দাও। আবার তুমি শ্রী ও প্রজ্ঞা দাও।

ব্রহ্মর্ষির সুরে সুর মিলাইয়া আজ পুনরায় তোমার বন্দনায় ব্রতী হইতেছি—

"বন্দে ভারত-মাতরং হিতরতাং ধর্ম্মার্থদাং মোক্ষদা
মারাধ্যামৃষি-সেবিতামনুপমাং শস্যান্বিতাং শোভনাম্।
ফুল্লাব্জাং শৈলরম্যাং সুবিমল-সলিলাং শ্যামলাং রত্নভূষাং
ত্রৈলোক্য প্রীতিগীতাং হিমগিরিমুকুটাং সাগরৈর্ধৌত পাদাম্॥"

ওঁ হ্রীং দেশমাতৃকায়ৈ নমঃ।

আবার তুমি প্রসন্না হও। ক্লীবত্বং হর দেশেশি, পুত্রত্বং দেহি দেহি নঃ। দেশ হইতে উৎপীড়ন দূর হোক্, দারিদ্র্য দূর হোক্, স্বার্থলিপ্সা দূর হোক্, ভ্রাতৃবিরোধ দূর হোক্, মহামারী দূর হোক্, দুর্ভিক্ষ উৎপাত দূর হোক্, অনাবৃষ্টি দূর হোক্, অতিবৃষ্টি দূর হোক্, বন্যা ও প্লাবন, ঝড় ও ঝঞ্ঝা দূর হোক্, ব্যাধি দূর হোক্। তোমার বক্ষে তোমার পুত্রগণ সত্যে

নিষ্ঠা এবং ঔদার্য্য ও মহত্ব নিয়া, স্বধর্ম্মে প্রবল আগ্রহ নিয়া, বীরত্ব ও সাহসের সহিত বসবাস করুক। ঘরে ঘরে তোমার পূজার মঙ্গলঘট স্থাপিত হউক, ঘরে ঘরে তোমার বীর পুত্রগণ আবার সংকল্পবদ্ধ হউক, ঘরে ঘরে বীর পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করুক। দেশের শত্রু নিপাত হোক্, দেশের পঞ্চম বাহিনী দূরীভূত হোক্—

সর্ব্ব মঙ্গল-মঙ্গল্যে মহাশক্তি-প্রদায়িনী
ক্লীবত্বং হর দেশেশি পুত্রত্বং দেহি দেহি নঃ।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ—
প্রার্থনাঃ সফলাঃ সন্তু মাতস্তং কৃপয়াম্বিকে ॥

। ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা—১৩৭২।

সরস্বতী-ই পরাবিদ্যা

আত্মজ্ঞ ঋষিগণ যদিও পরা অপরা দুই প্রকার বিদ্যার কথা বলিয়াছেন তথাপি তাঁহারা পরা বিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। পরাবিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যাই জ্ঞানাগ্নি। এই জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেই জৈববোধ বিনষ্ট হয়। অগ্নি যেমন সমস্ত ইন্ধনকে দগ্ধ করে সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত বাসনা কামনা ও কর্ম্মফলকে দগ্ধ করে।—জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। মানুষ ত্রিবিধ ভেদের মধ্যে প্রথম অবস্থান করে। বিজাতীয়, স্বজাতীয় ও স্বগতভেদ। একজন মানুষের সঙ্গে পশুপক্ষীর যে ভেদ তাহাই বিজাতীয় ভেদ। মানুষের সঙ্গে

মানুষের যে ভেদ, গরুর সঙ্গে গরুর যে ভেদ তাহাই স্বজাতীয় ভেদ। মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ হাত নাক মুখ প্রভৃতি নিয়া যে ভেদ তাহাই স্বগত ভেদ। তমগুণাচ্ছন্ন মানুষের মধ্যে থাকে বিজাতীয় ভেদবুদ্ধি বেশী। জ্ঞানাগ্নি সেখানে প্রায় স্তিমিত। রজগুণ মিশ্রিত মানুষের মধ্যে থাকে স্বজাতীয় ভেদ বেশী। তথায় অন্তরের বিকাশ, জ্ঞানের প্রকাশ একটু একটু করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। মূঢ়তা জড়তা দূর হইতে থাকে। প্রীতি ও উদারতার ভাব অন্তরে ফুটিয়া উঠে। বাৎসল্য ভাব দেখা দেয়। ক্রমে মানুষ আরও পরিশুদ্ধ হইলে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তাহার জাগিয়া উঠে স্বগতভেদ প্রতীতি। সূত্রে যেমন মালা গ্রথিত থাকে সেইরূপ বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী ও মানুষের সঙ্গে অন্তরের এক নিবিড় সূত্র, মালা রচনা করে। সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সেই সূক্ষ্ম অন্তরের বিকাশকে, জ্ঞানের প্রকাশকে দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়। দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন এই তিনের মধ্যে ক্রমেই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে একাত্মবোধ। যিনি দেখিতেছেন, যাহা দেখিতেছেন ও দর্শনরূপ ক্রিয়া এই তিন মিলিয়া এক হইতে থাকে। দৃশ্য-সকল ছায়ার ন্যায় দ্রষ্টার অন্তরে উদ্ভাসিত হইতে থাকে।—ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। দ্রষ্টা হইতে অর্থাৎ যিনি দেখিতেছেন ও অনুভব করিতেছেন তিনিই একাংশে দৃশ্য আকারে আকারিত হইতেছেন ইহা অনুভব হইতে থাকে। ছায়ার অস্তিত্ব যেমন কায়াকে বাদ দিয়া থাকে না সেইরূপ দৃশ্যের অস্তিত্বও দ্রষ্টাকে বাদ দিয়া থাকিতে পারে না। দৃশ্য দ্রষ্টারই প্রতিবিম্ব বা ভাব। জ্ঞানাগ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে অর্থাৎ দ্রষ্টা আরও ধ্যানমগ্ন হইলে দৃশ্য-সকল দ্রষ্টার সঙ্গে

মিশিয়া যায়; যেমন কাঠ ভস্ম হইয়া অগ্নির সঙ্গে মিশিয়া যায়; এইরূপ অনুভূতি লাভ করিলেই পরাবিদ্যা লাভ হয়। মা সরস্বতীর আরাধনা সার্থক হয়। জীব জীবন সার্থক হয়। এই জ্ঞানাগ্নি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, পরাবিদ্যা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ মা সরস্বতীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বার বার জন্ম মৃত্যু হইবে। ক্ষণে স্বর্গে, ক্ষণে পিতৃলোকে বা মর্ত্তে আসিতে হইবে। যাইতে হইবে। মরিতে হইবে। জন্মাইতে হইবে।

মানুষ মাত্রই প্রথম দৃশ্যকে—জগৎকে নিজের সত্তার চেয়ে ঘন সত্তাশীল বলিয়া মনে করে। এই প্রপঞ্চকেই নিজের চেয়েও সত্য ভাবে। তাই শত সহস্র ঘাত প্রতিঘাত খাইয়াও জাগতীয় বস্তু, নাম, যশ আহরণের জন্য ব্যস্ত হয়। অর্থ নারী যশ লাভের জন্য, ভোগ করিবার জন্য এই প্রপঞ্চের দিকেই ধাবিত হয়। এই প্রপঞ্চের নাম—সংসার। যাহা সরিয়া সরিয়া যায় ধরা দেয় না তাহাই সংসার। কায়া যদি ছায়াকে ধরিতে যায় তাহা হইলে ছায়াও কায়ার সঙ্গে দৌড়াইতে থাকে। জীব যদি জগৎকে ধরিতে যায় জগৎও তাহার সঙ্গে দৌড়ায়। কোন কালেই ধরা দেয় না। ইহাকেই মৃগতৃষ্ণা বলিয়াছে। ইহাকেই মরিচীকা বলিয়াছে। যে অনন্ত কাল শুধু ছুটায়, কখনও ধরা দেয় না তাহাইত মরিচীকা। কিন্তু হায়, যে ধরিবার জন্য এই নামরূপের পিছনে—প্রপঞ্চের পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছে সে যদি একবার স্থির হইয়া দাঁড়ায় তবেই দেখিতে পায় তাহার ছায়াও স্থির হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোতে দাঁড়াইলে যেমন ছায়ার সন্ধান আর পাওয়া যায় না, ছায়া কায়ার সঙ্গে মিশিয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রজ্জ্বলিত শিখার কাছে যদি জীব আসিয়া একবার দাঁড়ায়

তাহা হইলে এই নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ তাহার সত্তার সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই অবস্থাকেই তপস্বিগণ বলিয়াছেন—জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ করুতে তথা।—ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি-স্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

এই দিব্যজ্ঞান ;—এই পরিশুদ্ধ জ্ঞাতা ;—এই ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী সরস্বতী সকলের অন্তরের হৃদয় গুহাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যতদিন মানুষ ছায়ার পিছনে দৃশ্যের পিছনে নামরূপের পিছনে ছুটিয়া বেড়ায় ততদিন এই হৃদয় রাজ্যে অধিষ্ঠিত জ্ঞানময়ীকে দেখিতে পায় না। সে নিকটে থাকিয়াও দূরে। অন্তরে থাকিয়াও বাহিরে। দূরে সুদূরে। তাই জীব ছুটিয়া বেড়ায় শান্তির লালসায়, সুখের লালসায় দূরে সুদূরে। কিন্তু হায়, তাহার হৃদয়ের মাঝেই যে ঐ সুখময়ী ও ঐ শান্তিময়ী, ঐ বিরাট, ঐ ভূমা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

গুরু শিষ্যকে অন্তরের এই দিব্য পুরুষকে ;—অন্তরের এই জ্ঞানময়ীকে ;—অন্তরের এই ভূমাকে পাইবার পথ বলিয়া দেন। তাহাকে হংস করেন। তাহার অন্তরে পরাবিদ্যার—ব্রহ্মবিদ্যার উদ্বোধনী মন্ত্র প্রদান করিয়া বীজ রোপন করিয়া হংসে পরিণত করেন। হংস যেমন জল মিশ্রিত দুধ হইতে জলকে বাদ দিয়া দুধকে গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ আত্মজ্ঞান লিপ্সু হংস দিব্য মন্ত্রে উদ্বোধিত হইয়া এই জ্ঞান ও অজ্ঞান মিশ্রিত জগৎ হইতে অজ্ঞানকে বাদ দিয়া জ্ঞানকে আহরণ করিতে পারেন। যিনি অবিভক্ত হইয়া বিভক্তের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন, যিনি সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয়, অজ্ঞানীর নিকট অতি দূরে বলিয়া

অতি অপরিচিত, তাহাকেই একদিন হংসরূপী যজমান, আত্মজ্ঞান-লিপ্সু সাধক অতি নিকটে দেখিতে পান। তিনি নিকটে ও দূরে। তিনি অন্তরে ও বাহিরে।—তদ্দূরে তদ্বন্তিকে,—তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।—"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।"—তিনি উপবিষ্ট থাকিয়া অর্থাৎ একস্থানে স্থির ভাবে থাকিয়াও দূর হইতে দূরান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তিনি এমনি ভাবে হৃদয় রাজ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন যে তাঁহার বরবপু দূর দূরান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তাঁহাকেইত, মত্বা ধীরো ন শোচতি—সেই মহান বিভূকে জানিয়া ধীরগণ অর্থাৎ আত্মজ্ঞগণ আর শোক করেন না। দুঃখ শোকের অতীত হন।—দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হন। সেই ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা আর শোক করেন না। কোন বস্তুর জন্য আর আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি অনুভব করেন এক পূর্ণ অবস্থা হইতে তাহার উদ্ভব হইয়াছিল আবার সেই পূর্ণত্বেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। অগ্নি স্ফুলিঙ্গ অগ্নিতে মিশিয়া গিয়াছে। বিজাতীয় ভেদ তথায় নাই। স্বজাতীয় ভেদও নাই। স্বগত ভেদ ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠে বাধিতানুবৃত্তিতে। গভীর সমাধিতে স্বজাতীয় ভেদ প্রতীতিও থাকে না। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলে লোকহিতকর কর্ম্মের জন্য প্রারব্ধ বশাৎ তাহার মধ্যে স্বগতভেদ বুদ্ধি জাগে। ইহাই হংসের অবস্থা। স্বগতবুদ্ধি জাগিলেও আর প্রপঞ্চের পিছনে কাম ক্রোধ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ধন জন মানের প্রত্যাশী হইয়া ছুটিয়া বেড়ায় না। দেহান্তে সেই পরমধাম লাভ করে !—যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে। সেখানে গেলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

ইহাই ভারতীয় কৃষ্টি। ইহাই আর্য-বিদ্যা। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা।

এই ব্রহ্মবিদ্যার কথাই সেই নিভৃত কাননে বসিয়া ঋষিবৃন্দ তাঁহাদের শিষ্য পুত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। প্রার্থনা করিতেন— অবানুচানমবশিষ্যম্। শিষ্যও প্রার্থনা করিত—অব ত্বং মাম্, অব বক্তারম্। প্রার্থনা করিত—মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।— হে শান্তিময় ব্রহ্ম! হে প্রিয়! হে আপন হতে আপন! হে অমৃতময়, তুমি আর আমাকে ত্যাগ করিও না। আমিও যেন আর তোমাকে অস্বীকার না করি। তোমাকে অবজ্ঞা না করি। তোমাকে যেন ভুলিয়া না যাই।—বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে! দাও বিদ্যা দাও। দাও ধী দাও। দাও তোমাতে অবস্থিতির অধিকার দাও। সব ঝরে যাউক। সব খসে যাউক। ভিক্ষা ভরা থালি খালি হউক। অন্তর রাজ্য শুধু তোমার প্রেমে পরিপূর্ণ হউক। তোমার আলোতে উদ্ভাসিত হউক। এস পরাবিদ্যারূপিণী ব্রহ্মস্বরূপিণী, অন্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত কর্ম্ম-ফলকে ভস্ম করিয়া তুমি নির্ম্মল হইয়া জ্বলিয়া উঠ। ভস্ম কর। ভস্ম কর। দগ্ধ কর। পূর্ণ কর। পূর্ণ কর।

ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈক মূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা—১৩৭২।

বিধাতার রোষ তারেও যেন দহে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে ;
তব রোষ তারে যেন তৃণ সম দহে।

ঈশ্বরের রাজ্যে আসিয়া যে অন্যায় করে এবং যে অন্যায় সহ্য করে উহাদের কাহাকেও বিধাতা ক্ষমা করেন না। তাঁহার সুনিয়ন্ত্রিত কঠোর বিধান উভয়েই ভোগ করে। দণ্ড বিবিধ প্রকারের হয়। দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি, যোগ্য পুত্রের বিয়োগ, অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বিয়োগ, কঠোর দারিদ্র, আবাল্য অন্ধ বধির খঞ্জ হওয়া প্রভৃতি নানা প্রকারের শাস্তি বিধাতা দিয়া থাকেন তাঁহার রাজ্যে আসিয়া যাহারা অপরাধ করে ও অপরাধ সহ্য করে তাহাদের। একই জন্মে বা জন্মান্তরে। পূর্ব্ব জন্মের অপরাধের জন্য পরজন্মে যে শাস্তি পায় তাহার প্রমাণ ? আবাল্য কেহ পঙ্গু অন্ধ বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, ইহাই'ত পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম্মের ফল। এই কথার বিরুদ্ধে বহু তর্কজাল সৃষ্টি করিলেও শেষ মীমাংসায় স্বীকার করিতেই হয় জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফলকে। থাক সে কথা। আমরা বলিয়াছিলাম অন্যায় যে করে ও অন্যায় যে সহে এই দুই জনকেই বিধাতা দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু একটি তৃতীয় পক্ষ রহিয়াছে যাহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই দৃপ্ত ঘোষনায় উল্লেখ করেন নাই। সেই তৃতীয় পক্ষ হইল

—যে অন্যায় করিবার প্ররোচনা দেয় সেই ব্যক্তি। পুত্র অপরাধ করিলে পিতা যদি তাহা নিরবে সহ্য করে তবে বিধাতার রোষে উভয়কেই পতিত হইতে হয়। কিন্তু অনেক পিতা-মাতা পুত্র কন্যার অপরাধ শুধু সহ্যই করে না, অপরাধ করিবার প্ররোচনাও দিয়া থাকে। প্রতিবেশীর পুত্রের সঙ্গে নিজের বালক পুত্র কলহ করিলে অনেক পিতামাতা নিজের পুত্রের দোষকে ছোট করিয়া দেখে এবং তাহাকে প্রতিশোধ লইতে প্ররোচিত করে। অথবা নিজেরাই তুর্ব্বল প্রতিবেশীর পুত্রের উপর প্রতিশোধ লইয়া পুত্রকে ভবিষ্যৎ জীবনে অন্যায় করিবার প্ররোচনা দেয়। ইহা শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই ঘটিতেছে না। ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনেও ঘটিতেছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রতি, শূদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি, বাঙ্গালী বিহারীর প্রতি, বিহারী বাঙ্গালীর প্রতি; বৈষ্ণব শাক্তের প্রতি, শাক্ত বৈষ্ণবের প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই এ বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। সমাজের নেতাগণ, ধর্ম্মের নেতাগণ তথা রাষ্ট্রনেতাগণ সেই কলহে ইন্ধন দেয়। বর্ণ বিদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষ ও দলগত বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বুকে বর্ত্তমানে এমন একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে যাহারা অনেক পাপ কর্ম্মকে অন্যায় বলিয়া ত মনে করেই না এমন কি উহাকে তাহারা তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই মনে করে। পুত্র যদি পরস্ত্রীকে ধর্ষণ করে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্ম নষ্ট করে, গৃহদাহ করে, এমন কি বিষদান করে, উহাতে শুধু তাহার পিতাই নহে সেই ধর্ম্মের অনেক খ্যাতনামা ধার্ম্মিক তাহাকে উৎসাহিত করে ধর্ম্মের নামে। তাহারা নিজ নিজ দেশ ও জাতির স্বার্থের জন্য অন্য দেশ ও জাতির মধ্যে কলহ সৃষ্টি করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করে। বর্ত্তমান পৃথিবীতে

যাহারা নিজেদের অত্যন্ত সুসভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে তাহারাও পরস্পরের মধ্যে হানাহানির সৃষ্টি করিয়া নিজেদের অন্তরালে রাখিয়া সেই হানাহানির সুযোগে নিজেদের সমৃদ্ধি-লাভের জন্য কতই না প্রয়াসী। তাহারা শুধু অন্যায় করে না, অন্যায় করিতে প্ররোচনাও দেয়। মানুষের অন্তরে বিষ ঢালিয়া দেয়। মানুষকে হিংস্র পশু অপেক্ষাও ভয়াবহ জন্তুতে পরিণত করে। আজ আমি তাহাদের কথাই বিশেষভাবে বলিতেছি। এই অন্যায়ের প্ররোচনা দাতাদের সত্যই কি বিধাতা ক্ষমা করিবেন ?

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে পাপিষ্ঠ দুর্যোধনের রাজ সভায় পাণ্ডবগণ পাশাখেলায় পরাজিত হইতে হইতে নিজেদেরও পণ রাখিয়া দুর্যোধনের ক্রীতদাস হইয়াছিলেন। সেই পরাজিত ক্রীতদাস রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ সরল পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির কুচক্রীদের চক্রে ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকেও অক্ষক্রীড়ায় পণ রাখিয়া হারান। দুঃশাসন রজস্বলা দ্রৌপদীকে অন্তঃপুর হইতে কেশাকর্ষণ করিয়া রাজসভায় নিয়া আসে এবং উলঙ্গ করিতে প্রয়াসী হয়। অতি বীর্য্যবান দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম নপুংসকের ন্যায় তখন নিরপেক্ষ দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেন। কর্ণ বীর হইলেও প্রতিশোধের মনোবৃত্তি নিয়া নারীর অপমানে শুধু প্রশ্রয়ই প্রদান করেন নাই প্ররোচনাও প্রদান করেন। উল্লাসে অট্ট-হাসিতে কৌরবকুল জয়ঢাক বাজাইয়াছিল। পরিণামে কি ঘটিয়াছিল, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে তাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পাপিষ্ঠ পুত্রদের পাপকার্য্যে বাধা প্রদান করেন নাই বলিয়া শতপুত্রের শোক তুষানলে বিদগ্ধ হইয়াছিলেন। ইতিহাসের পাতায় কলঙ্ক কালিমায় লেখা রহিয়াছে জিতেন্দ্রিয়

ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপাচার্য ও কর্ণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষদের নাম। শুধু তাহাই নহে, ইহাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে,—ভীষ্মদেব অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন একুশ দিন শরশয্যায় শয়ান থাকিয়া। দ্রোণাচার্য্য পুত্র শোকে দগ্ধ হইয়াছিলেন, যদিও তাহা ছিল মিথ্যা সংবাদ।

বালীকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। সীতা উদ্ধার হইলেও সেই সাধ্বী সীতাকে নিয়া তিনি আর রাজসিংহাসনে বসিতে পারেন নাই। প্রাণাধিক অনুজ লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিয়া অন্তর দাহে বিদগ্ধ হইয়াছিলেন। সরযুতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যায়ের প্রতিবিধান বিধাতা করিয়াছেন উহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু আজ পৃথিবীর বুকে যে জঘন্যতম পাপকার্য্য চলিতেছে, কই তাহারা'ত অদ্যাপি বিধাতার রোষে দণ্ডিত হইল না? একটি সীতা লাঞ্ছিত হইয়াছিল বলিয়া রাবণকুল ধ্বংস হইয়াছিল। একটি দ্রৌপদী লাঞ্ছিত হইয়াছিল বলিয়া কুরুকুল ধ্বংস হইল। কিন্তু আজ শত সহস্র নারী শুধু অপমানিত নহে, ধর্ষিত হইতেছে। নিরস্ত্র অক্ষম পিতা-মাতা স্বামী শ্বশুর প্রভৃতির সম্মুখেও শতশত যুবতী নারী ধর্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে। একটি জতুগৃহ নহে, লক্ষ লক্ষ গৃহ দগ্ধ হইতেছে। অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পঞ্চপাণ্ডব অরণ্যবাসী হইয়াছিল কিন্তু আজ লক্ষ লক্ষ নরনারী অরণ্যবাসী—বাস্তুহারা, গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রে সহস্র সহস্র অসহায় মানুষ, নিরস্ত্র মানুষ, দুর্ব্বল মানুষ, অবোধ অনূঢ়া বালিকা প্রৌঢ়া বৃদ্ধ নিহত। এই পৈশাচিক দুর্ঘটনা ঘটিতেছে সুসভ্য বলিয়া পরিচিত রাষ্ট্র ধুরন্ধরদের নিকট হইতে দিনের পর দিন উৎসাহ ও প্ররোচনা

পাইয়া। তাহারা ইন্ধন দিতেছে। হলাহল ঢালিয়া দিতেছে। আর উল্লাসের অট্টহাসি হাসিতেছে। মানুষ হিংস্র পশু অপেক্ষাও ভয়াবহ হিংস্র হইয়া দুর্দ্দশার জীবন যাপন করিতেছে। সুসভ্য জাতিগুলি শান্তিদানের বিপনী খুলিয়া কুকার্য্যের প্ররোচনা দিতেছে। সামনে শান্তির নিশানা রাখিয়া পশ্চাতে বিষের ভাণ্ড হইতে বিষ ঢালিয়া দিতেছে। তাহারা শুধু অন্যায় করিতেছে না, পৃথিবীময় অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় ও প্ররোচনা দিতেছে।

হে বিধাতা, তোমার রোষ কি তাহাদিগকে দগ্ধ করিবে না? অস্ত্র ধন তথা পাশবিক বলে বলবান হইয়া তোমার সৃষ্ট সুন্দর বিশ্বকে যাহারা নিয়ত আশীবিষে দগ্ধ করিতেছে তাহাদিগকে তুমি কি দিনের পর দিন বর্ষের পর বর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া শুধু ক্ষমাই করিবে? তবে কেন কবি গাহিলেন—তব রোষ তারে যেন তৃণ সম দহে। অন্যায় যে করে এবং অন্যায় যে সহ্য করে তাহা অপেক্ষাও কি জঘন্য পাপী নয় সেই নরপুঙ্গবগণ যাহারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়? অন্যায়ের ইন্ধন জোগায়? দীর্ঘ যুগ যুগ বহিয়া কি শুধু এই অন্যায়ই চলিবে? অদৃষ্টের দোহাই দিয়া, কালের দোহাই দিয়া অসহায় মানুষ দগ্ধ হইতে পারে, নিপীড়িত হইতে পারে কিন্তু তোমার রোষ কি অন্যায়ের সেই প্ররোচকদিগকে তথা অন্যায়কারীদিগকে ক্ষমাই করিবে? হে বিধাতা! হে দণ্ডদাতা! তোমার ভয়ে সূর্য্য আলো দেয়, বাতাস প্রবাহিত হয়, মৃত্যু আসিয়া বার বার মানুষকে গ্রাস করে; আর তোমার এই সুনিয়ন্ত্রিত জগতেই দিকভ্রান্ত পথভ্রষ্ট পাপাচারিগণ জ্ঞানপাপিগণ বর্ষ বর্ষ ব্যাপিয়া শুধু ক্ষমাই পাইবে? হে বিষ্ণু! তোমার

হাতের শঙ্খচক্র গদা কি এই পাপাত্মাদের জন্য অবার উদ্যত হইয়া উঠিবে না? হে ভৈরব, তোমার ডমরু কি বাজিবে না? ত্রিশুল কি উদ্যত হইবে না? ওগো করাল বদনা ঘোরা! তোমার অসি কি অসুর নিধনে ক্ষীণধার হইয়াছে? ওগো দনুজদলনী! তোমার দশভুজের ঐ প্রহরণরাশি কি আর অসুরকে আঘাত করিবে না?

দিকে দিকে সত্য ও অন্যায়ের ডমরু বাজিয়া উঠুক। দিকে দিকে দৈত্যকে নিধন করিতে, ভক্তকে অভয়দান করিতে, হে ভৈরব! তোমার ত্রিশুল নিক্ষেপ কর। হে সুদর্শনধারি! তুমি তোমার গদা ও চক্রকে ঘুর্ণায়মান কর। এস দনুজদলনী! রণ-হুঙ্কারে দশদিকে দশবাহু প্রসারিত করিয়া—দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তনাং অভয়ায় চ। সত্যের জয় হউক। ন্যায়ের জয় হউক। মানবতার জয় হউক। আদর্শবাদের জয় হউক।

ক্ষয় হউক। ক্ষয় হউক। লুপ্ত হউক যত পাপ যত পাপাচারী। লুপ্ত হউক যত অজ্ঞানতা। লুপ্ত হউক যত কুসংস্কার।

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা—১৩৭২।

নাম ও নামী

কেহ কেহ বলেন নামী অপেক্ষা নাম শ্রেষ্ঠ। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন ভগবান রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া যতজন পাপীতাপীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহার নামে তদপেক্ষা বহু পাপীতাপী এবং বহু সাধক প্রাণে শান্তি পাইয়াছেন। রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া অহল্যাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন কিন্তু রামনামে শত শত খল ও কুমতি উদ্ধার পাইয়াছে। রামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন বিশ্বামিত্র ঋষিকে তপস্যার সুযোগ দানের জন্য আর রামনামে ভক্ত হৃদয়ের অসংখ্য দুরাশা ও কুপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে ইত্যাদি। এসকল দৃষ্টান্ত তাঁহারা তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' হইতেও দিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও বৈষ্ণব ভক্তগণ বলিয়া থাকেন কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণনামের মহিমা অধিক। উদাহরণ স্বরূপ বলিয়া থাকেন একটি তুলসীপত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়া ওজন করা হইয়াছিল। উহা নাকি শ্রীকৃষ্ণের ওজন অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল।

এখন জিজ্ঞাস্য যদি রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ না করিতেন অর্থাৎ এই ধরায় অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে এই রামনাম ও কৃষ্ণনাম পরবর্তী ভক্তগণ কোথায় পাইতেন? তাঁহারা জীবের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই ত' জীব সেই নামীর সঙ্গে সংযুক্ত নামকে পাইয়াছে। শুধু নামই পায় নাই, পাইয়াছে নামের সঙ্গে নামীর গুণ ও মহিমা।

নাম উচ্চারণ মাত্রই নামীর গুণ ও মহিমা তাহার অন্তরে ফুটিয়া উঠে। সেই নামের দ্বারা পবিত্র হয়, পাপ হইতে বিমুক্ত হয় তাহার অন্তর। যে ব্যক্তি তেঁতুলের গুণ জানে না, সে যদি তেঁতুল তেঁতুল বলিয়া লক্ষ লক্ষ বার জপ করে তবু তাহার জিহ্বায় রস আসে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তেঁতুলের রস একবার আস্বাদন করিয়াছে অথবা তেঁতুলের রস সম্বন্ধে শুনিয়াছে তাহারই জিহ্বায় তেঁতুল উচ্চারণ করিতে করিতে রস আসিয়া থাকে। এখানে তেঁতুল নামের সঙ্গে তেঁতুল বস্তুর অর্থাৎ নামের সঙ্গে নামীর নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই জিহ্বায় রস আসে। তেঁতুলের বেলায় যেমন ইহা সত্য, তেমনি রামনাম কৃষ্ণনাম দুর্গানাম বা শিব নাম উচ্চারণের বেলাতেও ইহা তুল্য সত্য। নামের সঙ্গে নামীর গুণ ও মহিমার এক নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাহা নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনের অবচেতনা হইতে কিছুটা ভাবের উদ্রেক না করিলে শুধু অজ্ঞাত একটি নামের উচ্চারণ দ্বারা কোন কল্যাণই সাধিত হইতে পারে না। নামের সঙ্গে নামীর যেখানে গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে সেখানে নামের উচ্চারণে অন্তরে ভাবের ও রসের উদ্রেগ হয়। অতএব নামী অপেক্ষা নাম শ্রেষ্ঠ এই কথা বলা সমীচীন নহে। নাম ও নামীর যত অভিন্ন প্রতীতি হইবে, ততই অন্তরে হইবে ভাবের উদ্রেগ, ততই চিত্ত হইবে বিশুদ্ধ, মন হইবে শান্ত। নামের সঙ্গে নামীকে মনন কর, নামীকে স্মরণ কর, নামীর গুণ ও মহিমার কথা চিন্তা কর, নামীর চরণে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য ঢালিয়া দাও, তবেই নাম জপ সার্থক হইবে।

রূপ অপেক্ষা নাম অর্থাৎ শব্দ বড়—ব্যাপক। নাম

অপেক্ষা নামী অনেক বড়। রূপ ক্ষণস্থায়ী, নামও ক্ষণস্থায়ী, নামী চিরস্থায়ী। নামীগণ আসেন তাঁহাদের নিত্য ধাম হইতে যুগে যুগে নানা রূপ ও নাম লইয়া। রূপ অর্থাৎ দেহ তাঁহারা রূপের জগতে ফেলিয়া যান। নাম কালের স্রোতে শব্দের জগতে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু নামী শাশ্বত সত্য, চির সনাতন। তাঁহার নিত্যধাম হইতে, তাঁহার শাশ্বত স্বরূপ হইতে তিনি আসেন গুণ ও মহিমা লইয়া অন্ধ পথিকগণকে পথ দেখাইতে নাম ও রূপ লইয়া। অতএব রূপকে নামী ভাবিলে ভুল হইবে। রূপই নামী নহে, নামী বিরাট ভুমা অজয় অব্যয় অক্ষর শাশ্বত সনাতনেরই মূর্ত্ত রূপ মাত্র। তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছিলেন—আমিও বহুবার জন্মিয়াছি নাম ও রূপ লইয়া—হে অর্জ্জুন তুমিও জন্মিয়াছ। আমি তাহা জানি কিন্তু তুমি তাহা জান না। তিনি, সেই অব্যয় পুরুষ, নাম ও রূপ ধারণ করেন বলিয়াই তাঁহাকে নাম ও রূপ বলা হয়। কিন্তু জীব শত স্থানে তাঁহাকে পাইবে বলিয়াই তিনি রূপ হারা, শত নামে তাঁহাকে পাইবে বলিয়াই তিনি নাম হারা। আমরা সকলে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে রূপ ও নামের মধ্য দিয়া সেই নামীকেই চাহি, সেই মহানকেই চাহি।

কোন কোন বৈষ্ণব সাধক বলিয়াছেন 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি' এই বৈষ্ণব সাধকগণ নাম ও নামীর মধ্যে অভিন্ন রসের সন্ধান পাইয়াছিলেন। নাম বলিলেই নামী ফুটিয়া উঠিবে অন্তরে, তাঁহার গুণে ও মহিমায় অন্তর হইবে গুণান্বিত ও মহিমান্বিত, ইহাই নাম জপের সার্থকতা। শাস্ত্র বলে 'তদ্ জপ তদর্থ

ভাবনম্'। জপের সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও চিন্তা করিবে। যে মন্ত্রের অর্থ নাই, সে মন্ত্র জপের কোন ফল নাই। অর্থ মানে মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তুর গুণ ও মহিমা। গুণ ও মহিমাকে বাদ দিয়া কোন বস্তুরই অবস্থিতি নাই। প্রত্যেক বস্তুরই কিছু গুণ আছে —মাটী জল অগ্নি এসকল বস্তুরও গুণ আছে। জলের গুণ যে জানে না সে পিপাসার সময় জল না চাহিয়া মাটীও চাহিতে পারিত। কিন্তু তাহাত চাহে না। অতএব ভগবান রামচন্দ্রের বা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও গুণ জানিয়া নাম উচ্চারণ করিলেই জপ সার্থক হইবে। নামীই শ্রেষ্ঠ, নাম নামীকে পাওয়ার সোপান মাত্র।

নামী বলিতে শুধু দেহকেই বা রূপকেই বুঝায় না। পূর্ব্বেও বলিয়াছি প্রতি রূপকে-অবলম্বন করিয়া প্রতি রূপের তলায় তলায় রহিয়াছে মহিমা ও গুণ। তেমনি গুণ ও মহিমার পিছনে রহিয়াছে গুণী। সেই গুণী অবয়ব বিশিষ্ট কোন বস্তু নহে। গুণ ও ভাবের উৎপত্তি হয় এক বিরাট সত্তা হইতে। সত্তা যখন ভাবের উদ্বেলনে বা গুণের উন্মাদনা লইয়া রূপায়িত হয় তখনই হইতে থাকে বিভিন্ন রূপের বা আকারের সৃষ্টি। নামী বলিতে তাই যথার্থ তত্ত্বদর্শীর নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠে সেই অনন্ত মহিমাময় সত্তা। সেই সত্তা হইতে বিভিন্ন যুগে গুণ ও মহিমা নিয়া তিনি অবতীর্ণ হন জীব ও জগতের কল্যাণের জন্য।

"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥"

স্বীয় অবিদ্যারূপ মায়াকে বশীভূত করিয়া প্রকৃতি পরতন্ত্র ও জন্মমৃত্যুর অধীন ভূত সকলকে আমি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি।

আবার আমিও আসি যুগে যুগে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য—দুষ্কৃতিশীলদের বিনাশের জন্য। অতএব দেখা যাইতেছে, আমি বলিতে দেহধারী বুঝায় না এবং নামকেও বুঝায় না। নাম ও দেহের পশ্চাতে রহিয়াছে নামী। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী নহেন তাঁহারা দেহকেই নামী মনে করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন নামী অপেক্ষা নাম বড়। তাঁহাদের সাধনালব্ধ জ্ঞান নাই, শুধু মস্তিষ্ক-চিন্তা দ্বারা এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু ধীমান সাধক—তোমরা মনে রাখিও এই স্থূল জগৎ বা নামরূপ বিশিষ্ট জগৎই পরম তত্ত্ব নহে। অবয়ব বিশিষ্ট দেব দেবীগণ সাধনার পরকাষ্ঠা বস্তু নহে। নাম ও রূপকে অবলম্বন করিয়া তত্ত্বে প্রবেশ কর। তত্ত্বের সাধনার দ্বারা পাইবে সেই 'তৎ' কে, সেই প্রেমাস্পদকে।

ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা—১৩৭২।

——*——

দেবসঙ্ঘ মঠ হইঁতে প্রকাশিত ধর্ম্ম পুস্তক

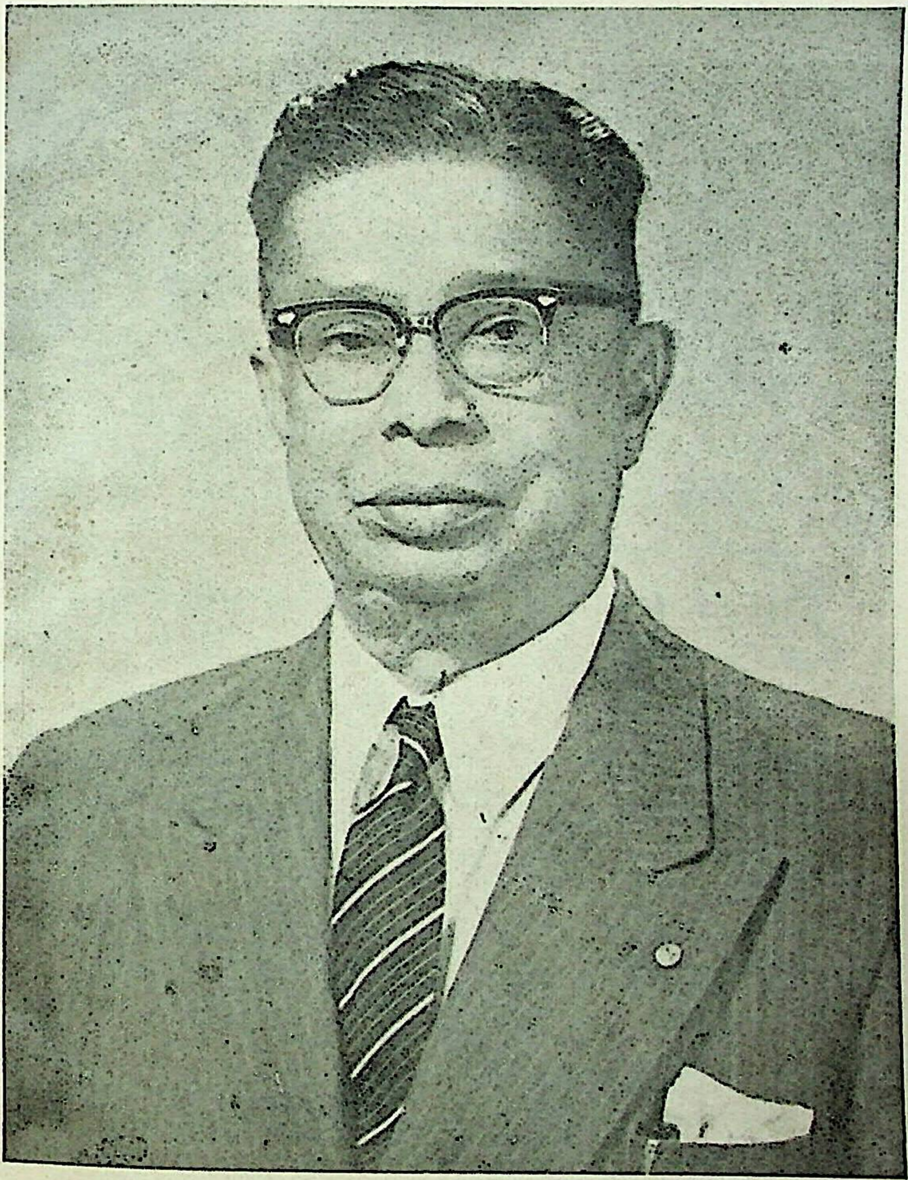
শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী রচিত

বাংলা

১। মন্ত্র ও পূজা রহস্য	৩·০০	৪·০০
২। প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা	১·০০	১·৫০
৩। সত্যের পথ বা আমির সন্ধান	১·০০	১·৫০
৪। হৈমবতী দর্শন	২·০০	২·৫০
৫। দশ মহাবিদ্যা কে ?	০·৮০	১·২৫
৬। নবদুর্গা কে ?	০·৮০	
৭। সাধনার গৃহে [প্রথম খণ্ড]	৩·৫০	৪·৫০
৮। ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব	২·৫০	৩·০০
৯। ভারত মাতা	০·২৫	
১০। পাথেয় [প্রথম খণ্ড]	৪·০০	৫·০০
শ্রীবাসন্তী দেবী রচিত		
১১। শ্রীগুরুলাভ ও দাক্ষিণাত্যের তীর্থদর্শন	৩·০০	৪·০০

English

1. WAY To TRUTH Or QUEST Of THE SELF	1·00
2. Worship of Varat Mata & why I celebrate it	0·25
3. Message of Encouragement	0·10



স্বর্গীয় নগেন্দ্র ভূষণ বিদ্

জন্ম—১৯শে এপ্রিল, ১৮৯৪ মৃত্যু—২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭

"স্বর্গীয় নগেন্দ্র ভূষণ বিদ্ স্মৃতি"

"মরণ ওগো মরণ
কও আমারে কথা
বক্ষ ভরে বইব আমি
তোমার নীরবতা"

জীবনের আসা যাওয়ার খেলা ঘরে কত মানুষ আসে, কত মানুষ চলে যায়। যুগ যুগ ধরে এমনি করে নিশিদিন চলেছে জীবনের বিচিত্র গতি।

জীবন তরী বেয়ে, আনন্দ গান গেয়ে যে পথিক এসে ঘাটে তরী ভিড়ায় সেই আবার একদিন পাল তুলে দেয় অচিন পথের যাত্রী হয়ে। কোথা কোন নিরুদ্দেশে তার যাত্রা কেউ জানে না। নীরবতাই শুধু তার সেদিনের একমাত্র ভাষা।

তারাই কৃতী, তাদের কথাই মানুষ মনে রাখে যারা আসা যাওয়ার পথে ছড়িয়ে রেখে যায় আপন সুরভি। সে সুরভি জাগায় নিশিদিন আনন্দ। সে সুরভি ভারাক্রান্ত করে তুলে হৃদয়কে স্মৃতির বেদনায়। মানুষের কাছে স্মরণীয় হবার, বরণীয় হবার পথ কুসুম ভরা নয়। জীবন বৃন্তে কুঁড়ি ধরে, ফুল ফুটে, সুরভি ছড়ায় কর্ম্ম, জ্ঞান, আদর্শ ও অধ্যাবসায়ের সাধনায়। জীবনের আদর্শ ও নিরন্তর সাধনাই তাকে নিতি নিতি করে মহৎ হতে মহীয়ান করে তুলে।

নগেন্দ্র ভূষণ বিদ্ সে কৃতী পুরুষদেরই একজন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। মরণের কোলে জীবন তাঁর ঢলে পড়েছে। কিন্তু তিনি হারিয়ে যাননি। তিনি আপন সুরভি ছড়িয়ে রেখে গেছেন চলার পথের দুধারে। বেঁচে রয়েছেন আমাদের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট অগণিত মানুষের মধ্যে স্বীয় কর্ম ও

আদর্শের সেই সুরভির ভিতর দিয়ে স্মৃতির পাতায় পাতায়।

স্বর্গীয় নগেন্দ্র ভূষণ বিদ্ ১৩০১ বঙ্গাব্দের ৫ই বৈশাখ, ১৯শে এপ্রিল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বহুবাজারে এক প্রখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শশীভূষণ বিদ্। শৈশবেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতামহ ছিলেন শ্যামাচরণ বিদ্। পিতামহের স্নেহেই তিনি প্রতিপালিত, পরিবর্দ্ধিত শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বিশ বৎসর বয়সে শ্রীমতী সুষমা বিদের সাথে তাঁর শুভ পরিণয় হয়।

ব্যবসা জীবনের মধ্য দিয়েই তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। পিতামহ শ্যামাচরণ বিদ্ই ছিলেন তাঁর এ পথের অগ্রণী। পরবর্ত্তীকালে স্বাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশ পরিভ্রমণ ও খনিজ ধাতুর অন্বেষণে আত্ম নিয়োগ করেন। এ কাজে সহায়তা করেন ভূতত্ত্ববিদ্ শ্রীহিমাংশু কুমার সেন। নগেন্দ্রবাবুই কলিকাতায় সর্ব্ব প্রথম ধাতব এন্‌টিমনির নিষ্কাষণ করেন। স্বাধীন চিন্তাধারা অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টা ও ন্যায় নিষ্ঠা বলে ক্রমে ক্রমে তিনি ব্যবসা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। নেপিয়ার-পেণ্ট, অলফাড্স্ লিঃ, ন্যাশন্যাল সিট্ মেটাল ওয়ার্কস্ লিঃ, বেঙ্গল পোরসিলেন এণ্ড কোম্পানী লিঃ প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁর সে কর্ম প্রচেষ্টার নিদর্শন। তিনি বাসন্তী কটন মিলেরও পরিচালক ছিলেন।

নগেন্দ্র ভূষণ বিদ্ মহাশয়ের সামাজিক জীবন ছিল সুদূর প্রসারী। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে গভীর ভাবে জড়িত ছিলেন। রোটারী ক্লাব, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি, পেণ্ট ম্যানুফেকচারারস এসোসিয়েশন, ন্যাশন্যাল বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ছিলেন তিনি বিভিন্ন সময়ে সভাপতি, চেয়ারম্যান, পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক। বিভিন্ন জনকল্যাণকর কাজেও তিনি বহু অর্থ

দান করেছেন। যাদবপুরে কুমুদবন্ধু টি, বি স্যানিটোরিয়ামে তিনি একটি ব্লক নির্ম্মাণ করে দিয়েছেন।

তিনি ছিলেন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। ধর্ম্মের প্রতি ছিল তাঁর সদা জাগ্রত দৃষ্টি। ধর্মকে তিনি শুধু জীবনে নীতি ও আদর্শ হিসাবেই গ্রহণ করেননি। গ্রহণ করেছিলেন জীবনের আঙ্গিক-রূপে। তাই ধর্ম্মের সুমহান আদর্শকেই তিনি জীবনের শেষ-দিন পর্য্যন্ত অনুবর্তন করে গেছেন। ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলেই তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। দেবসঙ্ঘ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের সাথে দীর্ঘদিন থেকেই তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর জীবন ও বাণীকেই তিনি জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নগেন্দ্রবাবু ও সুষমা মা শ্রীশ্রীবাবার নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীবাবার প্রদর্শিত পথেই তাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি সাধন করেন।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর যাবৎই তিনি চেষ্টা করতেন সাংসারিক পরিবেশ হতে দূরে সরে সদা সৎ প্রসঙ্গ ও সৎ চিন্তা নিয়ে দিনাতিপাত করতে। এজন্য তিনি বৎসরের অনেকগুলো দিনই কাটাতেন দেওঘরে আশ্রমের সমীপবর্ত্তী কোন বাড়ীতে। সেখানে থাকা কালীন তিনি প্রত্যহ দু'বেলা মন্দিরে প্রণাম ও প্রার্থনা করতে যেতেন এবং বিকালে শ্রীশ্রীবাবার সান্নিধ্য লাভ করে সৎপ্রসঙ্গে যোগদান করতেন।

১৯৬৫ খৃঃ শ্রীশ্রীবাবা নগেন্দ্রবাবুদের রাঁচির সন্নিকটস্থ টাটিসিলাইয়ের 'বিদ্ বাংলোতে' গ্রীষ্মকাল উদ্‌যাপন করেন। 'বিদ্ বাংলোর' পরিবেশ ছিল খুবই শান্ত এবং বিভিন্ন ফুল ও ফলের গাছে সুসজ্জিত। শ্রীশ্রীবাবা তথায় অবস্থানকালে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল হতে বহু ভক্তরাই তথায় সমবেত হতেন। নগেন্দ্রবাবু ও সুষমা মা গভীর আন্তরিকতা নিয়েই সকলের

জন্য সুব্যবস্থা করতেন। উভয়ের সুমধুর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও সদা জাগ্রত দৃষ্টিতে সকলেই মুগ্ধ হতেন।

দেবসঙ্ঘ আশ্রমের প্রতি ছিল নগেন্দ্রবাবুর একান্ত সহযোগীতা ও পরম শ্রদ্ধা। কোন্নগর আশ্রমে ৺শিবদুর্গা মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন এবং ৺শিব প্রতিষ্ঠা করেন। দেওঘর আশ্রমে জীবনকাল পর্য্যন্ত বসবাসের জন্য 'ভক্তধাম' নামে একটি স্বতন্ত্র ভবন নির্ম্মাণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে নগেন্দ্রবাবু ছিলেন সদা প্রসন্ন, নিরলস ও স্নেহপরায়ণ। অথচ কর্ত্তব্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা। অন্যায়ের প্রতি ছিল তাঁর অপরিবর্ত্তনীয় মনোভাব। এ দীর্ঘ জীবনে যাঁরাই তাঁর সংশ্রবে এসেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন নগেনবাবুর মধুর ব্যবহার ও ব্যক্তিত্বে। আশ্রমের প্রতিটি লোকের সাথে ছিল তাঁর সহজ সরল ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার। নগেন্দ্রবাবুর হাস্য পরিহাস ছিল সকলের কাছেই সদা আকর্ষণীয়। আশ্রমের পরম ভক্ত মাখালপুরের জমিদার ৺ভোলানাথ সিংহরায় মহাশয়ের সাথে ছিল নগেনবাবুর দীর্ঘদিনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা। এমন কি আশ্রমে অবস্থানকালে তাঁদের উভয়ের গমনাগমন ও উপবেশন ছিল একই সাথে।

আশ্রমের পরম ভক্ত ও বান্ধব ৺নগেন্দ্র বিদ্ মহাশয়ের পরলোকগত আত্মা চির শান্তি লাভ করুন, শ্রীগুরুর চরণে ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

। ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।